সাম্রাজ্যবাদ, ‘সাম্রাজ্য’ ও ক্ষমতার ত্রিভুজ

প্রদীপ বসু

ইরাক যুদ্ধকে সামনে রেখে আজকের বিশ্ব ক্ষমতার প্রকৃতি কী তা নিয়ে আমাদের আলোচনা। ক্ষমতার প্রকৃতি বিশ্লেষণে বিশেষভাবে কার্যকর হল মার্কসবাদ। তার অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক সত্ত্বেও। আর উত্তর আধুনিক তত্ত্ব। তার নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক সত্ত্বেও। যদিও অনেকের মতে, মার্কসবাদ ও উত্তর আধুনিকতাবাদ পরস্পর বিরোধী আমি এখানে তার উল্টো কথাটাই বলার চেষ্টা করব। আমার ধারণা, আজকের বিশ্ব ক্ষমতার প্রকৃতিকে বোঝার জন্যে এই দুই তাত্ত্বিক অস্ত্রকেই ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমার এই ধারণা (না কি বিশ্বাস?) নিয়ে সবিনয়ে এখানে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চাই। একেবারেই প্রাথমিক স্তরের সংশয়দীর্ণ এই ধারণাকে পরে কোনো যোগ্যতর গবেষক হয়তো বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। অথবা এর থেকে কিছু বিতর্ক, প্রশ্ন—আমার ভাবনার ফাটলগুলো, দানা বাঁধবে।

আলোচনাটা নিচের ছক অনুযায়ী এগোবে, যতটা সম্ভব।

(১) ইরাক যুদ্ধকে সামনে রেখে ক্ষমতাপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ।

(২) ঐ বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব।

(৩) লেনিনের তত্ত্বের পরবর্তী সময়ে বিশ্ব অর্থনীতি ও ক্ষমতায় অনেক গুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, যা লেনিনের তত্ত্বে ধরা পড়ে নি। সেই পরিবর্তনগুলো উল্লেখের একটি প্রয়াস।

(৪) লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের ধারণার বিকল্প হিসেবে নেগ্রি ও হার্টের ‘সাম্রাজ্য’ (এমপায়ার)-এর ধারণা। এমপায়ার ধারণার কতটা গ্রহণ, কতটা বর্জন করতে পারি, সেটা দেখার একটি প্রয়াস।

(৫) আলোকপ্রাপ্তি (এন্‌লাইটেন্‌মেন্ট)-র ক্ষমতা-এষণা (উইল-টু-পাওয়ার);

(৬) ক্ষমতার তিন মাত্রা নিয়ে ফুকোর বিশ্লেষণ ও ক্ষমতার ত্রিভুজের ধারণা।

১ ইরাক ও ক্ষমতা মার্কসবাদী বিশ্লেষণ

সৌদি আরবের পর ইরাকের রয়েছে সবচেয়ে বেশি তেলের ভান্ডার। আর তেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি আমেরিকাতেই। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ অনুসারে, ইরাক যুদ্ধ মূলত তেল সম্পদ দখলের জন্যে। যুদ্ধের কারণ সন্ত্রাসবাদ বা ইরাকিদের জন্যে গণতন্ত্র বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র (WMD) কোনোটাই নয়। বরং তেল। তার সাথে ইরাকে পুতুল সরকার বসিয়ে সেখানে মার্কিন বাহিনী অন্যের খরচায় মজুত রেখে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার ও তার তেলকেও দখলে নিয়ে আসাটা আমেরিকার লক্ষ্য থাকবে। ২০০২ সালের হিসেব অনুযায়ী, ইরাকের প্রমাণিত তেল সম্পদের পরিমাণ ১১,২৫০ কোটি ব্যারেল। অর্থাৎ সারা বিশ্বের তেল সম্পদের ১১ শতাংশ। সেদেশে উত্তোলনের অপেক্ষায় রয়েছে আরও ২২,০০০ কোটি ব্যারেল তেল। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈলভান্ডার দখল করতে পৃথিবীর বৃহত্তম পেট্রোল ব্যবহারকারী যে প্রবল লালসা নিয়ে আক্রমণে নামবে একথা সবাই বোঝে। “দুনিয়ার বৃহত্তম সংগঠিত অপরাধচক্র” তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার অধীনস্থ একটি পুতুল সরকার ইরাকে প্রতিষ্ঠা করতে, যে নাকি মার্কিন তৈল কোম্পানিগুলোকে অগ্রাধিকার দেবে এবং বুশ সরকার তখন সারা বিশ্বের পেট্রোলিয়াম যোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

বস্তুত আমেরিকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও ভাল নয়, রয়েছে করের চাপ, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিতে ঘুষ ও জোচ্চুরি, নাগরিকদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অভাব, সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত ঋণের বিরাট বোঝা, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা। এ অবস্থায় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে যুদ্ধ প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিন অর্থনীতি ও সরকারের কাছে আরও ভয়ের জায়গা হচ্ছে, ‘ডলার হেজিমনি’ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনায় উস্কানি জুগিয়েছে ইরাক। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে সে নিজের তেলসম্পদের বিকাশ ঘটায়। তেল শিল্পের জাতীয়করণ করে। এভাবে নিজের অর্থনীতি ও জাতীয় ঐক্যকে মজবুত করে। ইরাকি জাতীয়তাবাদ ইসলামী জাতীয়তাবাদ নয়। তা তেলকে ভিত্তি করে গঠিত। তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোকে সে এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোট হিসেবে সংগঠিত করতে চেষ্টা করে। সে জোট হয়ে ওঠে মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্যের সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

তেলের বাণিজ্য আগে চলত কেবল ডলারে। আর ডলার আছে শুধু আমেরিকার। তাই ডলার সংগ্রহের জন্যে আমেরিকার সাথে তেলের বাণিজ্য চুক্তিতে থাকাটা ছিল বাধ্যতামূলক। আমেরিকার মহা দাপট। সে ডলার উৎপাদন করে, অন্য দেশগুলো উৎপাদন করে পণ্য যা ডলার দিয়ে কিনতে হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য ‘ওপেক’ তৈরি হবার পর তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ে। ১৯৯১ সালে ইরাক সিদ্ধান্ত নেয় ‘ইউরো’ মুদ্রায় তেল বিক্রি করবে। ৬.১১.২০০০ তারিখে ইরাক রাষ্ট্রসংঘকে জানিয়ে দেয় তার ফুড ফর অয়েল কর্মসূচি রূপায়ণের বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে চাই ‘ইউরো’-কে। একথা এখন আর গোপন নেই যে ২০০০ সালের শেষ ভাগে সাদ্দাম হোসেন তেলের বিনিময়-মুদ্রা ডলার থেকে বদলে ‘ইউরো’ করে নিয়েছেন। তার কিছুদিন বাদে তিনি নিজের ১০ বিলিয়ন ডলার রাষ্ট্রসংঘে এসে ‘ইউরো’তে বদলে নিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে তেলের অফুরন্ত ভান্ডারের দেশে মুদ্রা হিসেবে ‘ইউরো’ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ইউরোপের অনেক দেশ চাইছে ইউরোকে শক্তিশালী করে ডলার হেজিমনি আটকাতে। ওপেক চাইছে ইউরোকে পেট্রোলের বিনিময়-মুদ্রা হিসেবে চালু করতে। ইরাকের পর ইরান এবং ভেনেজুয়েলাও ‘ইউরো’ মারফত তেল বিক্রির দিকে ঝোঁকে। ওপেকের চেষ্টা সফল হলে তেল ব্যবহারকারী দেশগুলোকে কেন্দ্রীয় অর্থভান্ডার থেকে ডলার ছেড়ে ‘ইউরো’ সংগ্রহ করতে হবে। ডলারের মূল্য ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পড়ে যাবে। আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি চরমে পৌঁছোবে। আমেরিকা ভীত, এরকম হাওয়া ঘুরতে থাকলে ডলার মুখ থুবড়ে পড়বে। মার্কিন শেয়ার বাজার থেকে বিদেশি মুদ্রা দ্রুত বেরিয়ে যাবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবে।

দেখা দেবে ব্যাপক মন্দা। বর্তমান ঘাটতি অবস্থা আর চালাকি দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না। সুতরাং মার্কসবাদীদের মতে সাদ্দামের 'ইউরো' প্রীতি আজ আমেরিকার ইরাক আক্রমণের পেছনে একটা বিশেষ কারণ। এই আক্রমণ আরও অন্যান্য পেট্রোলিয়াম উৎপাদকদের পরিষ্কার বোঝাতে যে ডলার ত্যাগ করলে কী হাল হতে পারে।

তবে মার্কসবাদ বলে যে সবটাই এত তাৎক্ষণিক কারণ নয়। যুদ্ধের পেছনে দীর্ঘকালীন কারণও আছে। এই যুদ্ধ দেখাল, তিনটি বড় আন্তর্জাতিক চরিত্রের দ্বন্দ্বের তীব্রতা বেড়ে চলেছে, সেগুলো হল—(১) সাম্রাজ্যবাদ বনাম নিপীড়িত জাতিগুলির দ্বন্দ্ব (২) পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোয় শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং (৩) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। স্পষ্টতই মার্কসবাদী বিশ্লেষণে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক চরিত্রটি যুদ্ধের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ, বা চূড়ান্ত বিচারে নির্ধারক কারণ বলেই বিবেচিত হয়েছে। এ ধরনের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক ঠিক না হলেও মার্কসবাদী বিশ্লেষণের গভীর বাস্তবমুখী অন্তর্দৃষ্টি মূল্যবান ও কার্যকর। মার্কসবাদী বিশ্লেষণ যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে মার্কিন রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সামরিক আগ্রাসনকে যুক্ত করে দেখাচ্ছে তা যথেষ্ট বাস্তবানুগ। ইরাক যুদ্ধের পেছনে কারণ একাধিক—অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক।

মার্কসবাদ বলে সঙ্কটই পুঁজিবাদকে আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক করে তোলে। আর সব সংকটেরই মূলে থাকে অর্থনৈতিক সঙ্কট। এক নাছোড় মন্দা ৩ বছর ধরে পক্ষাঘাত গ্রস্ত করে রেখেছে বিশ্ব-অর্থনীতিকে, বিশেষত তার মূল নিয়ন্তা মার্কিন অর্থনীতিকে। ১২ বছর আগে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মার্কিন অর্থনীতিতে কিছুটা তরতাজা ভাব ছিল। তাই রাজনৈতিকভাবে অনেক আক্রমণাত্মক জায়গা থেকে সে সামরিক আক্রমণে যেতে পেরেছিল। আজ কিন্তু তার সঙ্কট গভীরতর যা সে দেশের শাসক রাজনীতিক শ্রেণীগুলোর অবস্থানকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই এই মরীয়া যুদ্ধ। অন্যতম উদ্দেশ্য যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কৃত্রিমভাবে আবার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলা। মার্কিন অর্থনীতির আজকের সংকটের মোটামুটি ৩টি মূল উপসর্গ (১) চাহিদার অভাবজনিত দীর্ঘস্থায়ী মন্দার চক্র, (২) জমে ওঠা ঘাটতি ও ঋণের পাহাড় এবং (৩) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারে তীব্র হ্রাস। আর এসবের মূলে রয়েছে এক লাগামহীন ফাটকা পুঁজির খেলা, যা মার্কিন পুঁজিবাদকে পরিণত করেছে এক 'দুর্বৃত্তায়িত' পুঁজিবাদে। ৯০-এর দশকটা লগ্নি পুঁজির ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বব্যাপী ফাটকা পুঁজির দশক। এই 'ক্যাসিনো' পুঁজির হাত ধরে গত এক দশকে মার্কিন পুঁজিবাদেরও দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। এই দুর্বৃত্তায়নের পেছনে আছে মার্কিন কর্পোরেট জগতের ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মাতব্বররা। এনরন ও ওয়ার্ল্ডকমের মতো দৈত্যাকার বহুজাতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে। ঐ দুর্বৃত্তায়ন গ্রাস করেছে বড় বড় ব্যাঙ্ক, হিসাব পরীক্ষা সংস্থা, জনসংযোগ ও বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান তথা আইনি পরামর্শদাতা সংস্থা ইত্যাদিকে। ম্যানুফাকচারিং শিল্পের সাথে সঙ্গতিহীনভাবে পরিষেবা ক্ষেত্রটির তুলনামূলক অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ক্যাসিনো অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। কর্পোরেট ক্ষেত্রের আয়-ব্যয় সম্পত্তির হিসেবে কারচুপি ধরা পড়েছে। ২০০০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মার্কিন শেয়ার বাজারের ধবসের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন বা ৭ লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের পুঁজি মার্কিন বাজার থেকে উধাও। এর ছোঁয়ায় বিশ্বের সমস্ত শেয়ার বাজারগুলোতেই ৩ বছর ধরে তীব্র অবনমন চলছে। ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯,৯,৬৮.৪ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) ডলার। এই ঋণের অংশ হল গার্হস্থ্য ঋণ। মার্কিন ঋণের আর একটা বড় কারণ নির্বিচারে আমদানি। এর বিপরীত প্রভাব পড়েছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের চলতি খাতের ঘাটতির ওপর। এখন এই ঘাটতির পরিমাণ আমেরিকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন জিডিপির ৪%। ঋণের আর একটা বড় উপাদান মার্কিন বাজেট ঘাটতি। ঘাটতির মোকাবিলা করতে ও মন্দার বাজারে শস্তায় ঋণ সরবরাহ করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভ ৯/১০ দফায় সুদের হার প্রচন্ড কমিয়েছে। ঋণের আর একটা অংশ গেছে সংযুক্তিকরণ ও অধিগ্রহণের কাজে। আর এর মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে এক নতুন 'আর্থিক মোড়লতন্ত্র'। ১৯৮০-১৯৯৮ সময়কালে সংযুক্তিকরণ ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে শুধু মার্কিন ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে মোট ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদজাত পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। নিজেদের আর্থিক ব্যাভিচারের অর্থ জোটানোর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিদেশি পুঁজি আমদানির ওপরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেটা এতটাই যে বিদেশি পুঁজিপতিদের দখলে এখন মার্কিন সম্পদের মোট বাজার মূল্যের ১৮% এরও বেশি এবং মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের প্রায় ৪২%। মন্দার প্রভাবে বেকারত্ব, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার ঘটে চলেছে। মার্কিন শ্রম দপ্তরের সমীক্ষা অনুসারে বেকারত্বের হার বর্তমানে ৬.২%। বেসরকারি হিসেবে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। একদিকে ব্যাপক কর্মহীনতা ও অন্যদিকে কর্পোরেট জগতে ব্যাপক দুর্নীতি—এর ফলে একজন সাধারণ শ্রমিক ও একজন কর্পোরেট সি.ই. ও.-র মধ্যে আয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১ ১২৫০। সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্বকে লুণ্ঠন করেও, নয়া ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ চালিয়েও অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। ফলে আশু সমাধানের লক্ষ্যে তাকে আগ্রাসন, অস্ত্র বিক্রি, ষড়যন্ত্র, পরোক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ এমনকি যুদ্ধের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক আগ্রাসন একসময় অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতার মুখে পড়ত। কিন্তু ১৯৮৯ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধ-অপরাধগুলি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্যের পথ করে চলেছে, যথা লিবিয়া (১৯৮৯), ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (১৯৮৯), ফিলিপাইনস (১৯৮৯), পানামা (১৯৮৯-৯০), লাইবেরিয়া (১৯৯০), সৌদি আরব (১৯৯০-৯১), ইরাক (১৯৯০), কুয়েত (১৯৯১), সোমালিয়া (১৯৯২-৯৪), যুগোস্লাভিয়া (১৯৯২-৯৪), বসনিয়া (১৯৯৩-৯৫), হাইতি (১৯৯৪-৯৬), ক্রোয়েশিয়া (১৯৯৫), জাইরে (কঙ্গো) (১৯৯৬-৯৭), লাইবেরিয়া (১৯৯৭), আলবানিয়া (১৯৯৭), সুদান (১৯৯৮), আফগানিস্থান (১৯৯৮), ইরাক (১৯৯৮), যুগোস্লাভিয়া (১৯৯৯), আফগানিস্থান (২০০১), ইরাক (২০০৩)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৯০-২০০৩ বিগত এই ১১৩ বছরে আমেরিকা মোট ১৩০ বার অন্যদেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত ৫৮ বছরে ৬৫ বার অন্য দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে।

বিশ্বায়ন ও তথাকথিত উদার অর্থনীতি আজ ক্রেতা-উপভোক্তা-বিক্রেতার 'বাজার' সম্পর্ককে ঠিকঠাক চালু রেখে সংকটগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদকে সংকটমুক্ত করবে একথা মার্কিন পুঁজিপতিরাও বিশ্বাস করে না। 'অনন্ত যুদ্ধ' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংকট মুক্তির উপায়। 'বুশ ডকট্রিন', 'প্যাক্স আমেরিকানা' উপনিবেশ দখলের সামরিক-রাজনৈতিক মতবাদ। ১৯ ও ২০ শতকে ব্রিটিশ, ফরাসি, স্পেনীয় বা ওলন্দাজ উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ৫০ বা ১০০ বা ২০০ বছর ধরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম করে যে সব দেশ ও রাষ্ট্র পূর্ণ বা অর্ধ-স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাদের আজ 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে'র তালিকা-ভুক্ত করে বুশ ডকট্রিন প্রি-এম্পটিভ্ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছে। যুদ্ধ-আক্রমণ-লুণ্ঠন চালিয়ে ঐ সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্রে মার্কিনি অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে মার্কিনিকরণের চেষ্টা শু হয়েছে। 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে'র তালিকার ওপরের দিকে আছে ইরাক, ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া, লেবানন ইত্যাদি। ভারত, পাকিস্তান ও ইন্দো-চীনের দেশগুলিও তালিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ, বসনিয়ার যুদ্ধ, আফগানিস্থান আক্রমণ ও শেষ পর্যন্ত ইরাক যুদ্ধ (২০০৩) বিশ্বের সামনে সাম্রাজ্যবাদের প্রবলতম ক্ষমতাকে প্রাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করল। এই ইরাক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ তার বিপুল ক্ষমতাকে প্রদর্শন করল। সোভিয়েত-পরবর্তী বিশ্বের একমাত্র অতিবৃহৎশক্তি, একমাত্র সুপারপাওয়ার আমেরিকা তার একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সজোরে তুলে ধরল। অতএব এ-বিশ্ব বহুমেরুপ্রবণ হবার বদলে একমেরুপ্রবণ যাতে হয়ে ওঠে সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার কাজে ইরাক যুদ্ধ অনুঘটকের কাজ করলো। ইরাক আক্রমণ ও দখল করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু যে ইরাকের তেল দখল করতে চায় তা নয়। শুধু যে বিশ্বের তেল অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাও নয়। সে চায় একটা নয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠা করতে। সেই ব্যবস্থায় নিজের স্বার্থে ও নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন দেশ আক্রমণ করার ও দখল করার এবং যে কোনো অঞ্চল পুনর্গঠন করার অধিকার আমেরিকার থাকবে। বলা যায়, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ-চালিত বিশ্বায়ন সামরিক শক্তি প্রয়োগের এক নতুন দিশায় আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বায়নের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্র

াসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সামরিক শক্তি জোরদার করা এবং সেই শক্তির প্রয়োগ। এই পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা। তার নতুন সামরিক তত্ত্ব দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (১) ঠান্ডা যুদ্ধের পরে বিশ্ব আর্থিক ও সামরিক আধিপত্য এবং (২) সামরিক ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে তার একচেটিয়া অধিকার। সুতরাং বিশ্ব মার্কিন সামরিক শক্তি যে ভূমিকা নিয়ে চলেছে, তার তিনটি দিক (১) সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে চাই সামরিক শক্তির ব্যবহার, (২) অন্যান্য স াম্রাজ্যবাদী দেশের ওপর নেতৃত্ব দানের জন্যে এই শক্তি প্রয়োজন এবং (৩) দুনিয়ার অতিবৃহৎ শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করার জন্যে ইরাক, আফগানিস্তান প্রভৃতি তৃতীয় বিশ্বের দুর্বলতর দেশের ওপর আক্রমণ শানিয়ে যাওয়া দরকার। সঙ্গত কারণে আমেরিকার সামরিক খাতে ব্যয় সারা বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের (৯০০ বিলিয়ন ডলার) প্রায় অর্ধেক—যার মাত্র ১০ শতাংশ দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের অত্যাবশ্যক সামগ্রি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব (রাষ্ট্রসঙেঘর তথ্য)।

শুধু সন্ত্রাসবাদের আতঙ্ক কোনো ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের রাষ্ট্রসংঘকে এড়িয়ে ও আন্তর্জাতিক বিধি ভেঙে বিশ্বময় সামরিক আগ্রাসন চালানোয় তাড়িত করছে না। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা হিসেবে আমেরিকার নীতিই হল সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা বিরোধী যে কোনো প্রতিপক্ষকে বলপ্রয়োগ পর্যুদস্ত করা। এক্ষেত্রে একবিংশ শতকের বিশ্বায়ন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রচনার সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সামরিক বিস্তারের সাথে তুলনীয়। ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার দালাল সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে শু করেছে। অতীতের যুগোস্লাভিয়ার মতো ইরাককে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চ াইছে। তার ঐক্য ও অখন্ডতা বিপন্ন। তারা যাকে ইরাকের 'স্বাধীনতা' বলছে তা আসলে ঔপনিবেশিকীকরণ। তারা যাকে ইরাকের 'পুনর্গঠন' বলছে তা হল ধ্বংসযজ্ঞ ও খন্ডীকরণ। এতদিন আমেরিকাকে রাষ্ট্রসংঘের সম্মতি নিয়ে নানান জায়গায় যুদ্ধ করতে হয়েছে। এবার ব্রিটিশ মার্কিন জোট শক্তি আন্তর্জাতিক বৈধত ার ছাড়পত্র পায় নি। এটা দেখিয়ে দেয় আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ইরাক যুদ্ধ শুধুমাত্র আগ্রাসন চালানোর যুদ্ধ নয়। আফগানিস্থান পর্ব থেকে শু হয়েছে নতুনভাবে উপনিবেশ তৈরি করা। শু হয়েছে দখলদারির যুদ্ধ। কিন্তু ইরাককে উপনিবেশে পরিণত করার মার্কিন পরিকল্পনা ও তৎপরতাও উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছে না। তথাকথিত উত্তর-আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্রটি বদলে গেছে এমন কথা মার্কসবাদীরা বলেন না। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর অ ামেরিকার সামরিক শক্তি মোটেই হ্রাস পায় নি। ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর মার্কিন শাসককুল তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির নতুন কল্পিত বিদ্ধ শক্তি খাড়া করার বিষয়ে সচেতন হয়। দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের ধারণাটি এরপরই তৈরি করা হয়। ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রকে মার্কিন নীতির সবল বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়। এই বিশেষ তকমাকে বিশ্বাসযোগ্য করানোর জন্য এদের অস্ত্র সম্ভার নিয়ে প্রচার অভিযান শু হল। বলা হয় যে, এরা জনধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম। '৯১-তে উপস াগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে আমেরিকার নয়া সামরিক কৌশল প্রকাশ পেল। ৭৮ দিন ধরে যুগোস্লাভিয়ায় বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা দেখাল যে তারা কীভাবে শত্রুর আ র্থিক ও সামরিক প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আবার আফগানিস্থানের বিদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে যুদ্ধ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে অন্যান্য 'অবাধ্য' দেশেও এই পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। বুশ প্রশাসন ক্ষমতায় আসার পর পেন্টাগনে 'জয়েন্ট ভিশন ২০২০' নামে এক নতুন দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গৃহীত হয়েছে। এই কৌশল দিগন্তব্যাপী প্রাধান্যের (Full Spectrum Dominance) কথা বলে; এর অর্থ হলো মার্কিন সামরিক শক্তি নিজে যা অন্যান্য বহুজাতিক শক্তি বা এজেন্সির সহ ায়তায় যে কোনো প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে ও যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তার সামরিক শক্তির শেষ বিন্দুটুকুও প্রয়োগ করতে পারবে। এই দলিলে অ ারো আছে, "বিশ্বজুড়ে আমাদের স্বার্থরক্ষা ও দায়িত্ব পালনের পরিধিকে স্মরণ রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই বিদেশের মাটিতে তার ফৌজকে উপস্থিত রাখতে হবে এবং অত্যন্ত দ্রুত বিশ্বজুড়ে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এর মাধ্যমেই দিগন্তব্যাপী প্রাধান্যের তত্ত্ব কার্যকারী হবে।"

বর্তমান ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার একটা বিশাল পরিমাণ খরচ হবার কথা। কার মতে সেটা ৭৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি। ভারতীয় মুদ্রায় সেটা হল প্রায় ৩,১০,০০০ কোটি টাকা। ভারতের ৪ বছরের প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রায় সমান। মার্কিন কংগ্রেসের কাছে বুশ যুদ্ধের জন্যে এই পরিমাণ অর্থের অনুমোদন চেয়েছিলেন। এই অর্থ কিন্তু মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেটের জন্যে নির্ধারিত অর্থের বাইরে। দু এক মাস আগে বুশ সরকার ৩৭,৯০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা ব াজেট পেশ করেছিল। এক সপ্তাহে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার পেছনে আমেরিকা খরচ করেছে ১০০ কোটি ডলার। প্রতিদিন গোলাগুলি ছোঁড়ার পেছনে তার ১০০ কোটি ডলার লাগছিল। এক সপ্তাহের যুদ্ধে সে ৩০০০ কোটি ডলার খরচ করেছিল। আবার অন্য অনেকের মতে বর্তমান ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার খরচ ১১,০০০ কোটি ডলার। মার্কিন সরকারের কেন্দ্রীয় বাজেটের অফিস বলেছিল যুদ্ধের গতি ঠিক থাকলে খরচ হত ২,১০০ কোটি ডলার। গতি ধীর হলে ৩৩০০ কোটি ডলার। ব াজেট অফিস বলেছিল সরকার এত টাকা দিতে পারবেনা। ইরাক দখল করার পরে ইরাকের তেল বিক্রি করে তাই এ টাকা তুলতে হবে। প্রতিদিন ২৮ লক্ষ ব্যারেল তেল তুললেই টাকাটা উঠে আসবে। অকল্পনীয়রূপে বিশাল পরিমাণ অর্থ আমেরিকা ব্যয় করছে নিশ্চয়ই ইরাকিদের মুক্তিদানের আনন্দে নয়। এর প্রতিটি কান াকড়ি ও তার সাথে বিপুলতম বহুগুণ বেশি মুনাফার ছক তার করাই আছে। মার্কিন অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম নরবাউস তাঁর রিপোর্ট, 'দি ইকনমিক কনসিকে য়েন্সেস্ অফ এ ওয়ার উইথ ইরাক'-এ বলছেন, দ্রুত যুদ্ধ শেষ হলে খরচ হবে ৫০০০ কোটি ডলার। আর যুদ্ধ গড়িয়ে গেলে ১৪,০০০ কোটি ডলার। তবে তঁ ার মতে, সরাসরি সামরিক খরচ মোট খরচের ছোট অংশ। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচটা আরও বেশি। ফলত তাঁর হিসেবে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হলে মোট খরচ ৯৯০০ কোটি ডলার। আর দীর্ঘমেয়াদী হলে মোট ১,৯২,৪০০ কোটি ডলার খরচ হবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতা কীভাবে তাদের অর্থনৈতিক মুনাফার স্বার্থকে সিদ্ধ করার কাজে লাগে তার সুস্পষ্ট উদাহরণ 'ইরাকের পুনর্গঠন'। ইরাককে ধ্বংস করে ত াকে আবার গড়ে তোলা হবে। তার আনুমানিক আর্থিক মূল্য ২৫ বিলিয়ন থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার। যত ধ্বংস, তত লাভ। এই পুনর্গঠনের খরচ জোগাতে হবে ইরাকিদেরই। আর তা নিয়ন্ত্রণ ও বিলিবন্টন করবে আমেরিকা। আমেরিকা যেহেতু ইরাক ধ্বংসের নেতৃত্ব দিচ্ছে, এই বখরার সিংহভাগই পাবে মার্কিন কোম্পা নিগুলো। বিশেষত, মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের পেটোয়া কোম্পানিগুলো। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো দাবি করছে বখরার যথেষ্ট ভাগ, কারণ আমেরিক ার এক নম্বর সহযোগী তারাই। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া যেহেতু যুদ্ধ-বিরোধী, তাই মার্কিন প্রশাসন তাদের কোম্পানিগুলোকে কাজ দিতে অনিচ্ছুক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাই বলছে রাষ্ট্রসঙেঘর মাধ্যমে ইরাকের পূনর্গঠন হোক। ইরাক যুদ্ধের ব্যয় সাম্রাজ্যবাদের কাছে একটা লাভজনক বিনিয়োগ। মূলত, সাম্রাজ্যবাদী মা র্কিন রাষ্ট্রশক্তির ছত্রছায়ায় থেকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো শকুনের মতো ঘিরে ধরেছে ইরাকের বিধ্বস্ত শিল্প, তেল ও অর্থনীতিকে। লক্ষ্য তাদের 'পুনর্গঠন' বিনিয়োগ থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে কোনোরকমে ধামাচাপা দেওয়া।

খবরে প্রকাশ, যুদ্ধ শুর আগেই ইরাকে যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে কাজকর্মের জন্যে ৯০০ মিলিয়ন ডলারের বরাত স্থির হয় গোপনে। তাতে ৫টি কোম্পানি যোগদানের আমন্ত্রণ পায়। তারা সকলেই মার্কিন কর্তাদের ঘনিষ্ঠ। কে তেলের খনির আগুন নেভাবে, কে বন্দর, বিমান বন্দর, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল নির্মাণ করবে, কে বিদ্যুৎ সংযোগ করবে, কে জলের লাইন তৈরি করবে, আর সর্বোপরি কোন্ তেল কোম্পানিগুলি ইরাকের তেলের খনির দখল নেবে—এসবই নাকি ঠিক হয়ে গেছে। ব্রাউন এন্ড ট, কেলগ, হ্যালিবার্টন ইনকর্পোরেশান, বেকটেল, ফ্লুর কর্পোরেশান, লুইস বার্জার—এই সমস্ত ঠিকাদার কোম্পানিগুলোর নাম শোনা যাচ্ছে। এগুলো সবই মার্কিনি কোম্পানি। প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে এদের ওঠাবসা। বিশেষত শোনা যাচ্ছে হ্যালি বার্টনের নাম যার প্রধান একসময়ে ছিলেন ডিক চেনি, অ ামেরিকার বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি। হ্যালিবার্টন তৈলখনির যন্ত্রাংশের বিশ্বের বৃহত্তম কোম্পানি।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে মার্কসবাদীরা আজকে সাম্রাজ্যবাদের যে তত্ত্বকে ব্যবহার করছেন তা আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর আগে লেনিনের হাতে গড়ে ওঠে। এর পরের অধ্যায়ে আমরা লেনিনের সেই অসাধারণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে আলোচনা করবো।

২ সাম্রাজ্যবাদ লেনিনের তত্ত্ব

সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর (১৯১৬) গ্রন্থে লেনিন দেখিয়েছিলেন যুদ্ধ হল পুঁজিবাদের এক অনিবার্য, আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বিদেশ লুণ্ঠন, উপনিবেশ অধিকার ও অপহরণ, নতুন বাজার দখল এসব কারণে আগেই বহুবার পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছে। এসব রাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধ এক অতি স্বাভাবিক ও ন্যায্য ব্যাপার। ১৯ শতকের শেষে ও ২০ শতকের গোড়ায় পুঁজিবাদ সুনিশ্চিতভাবে তার বিকাশের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তরে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করে। আর যুদ্ধ তখনই একেবারে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। লগ্নি-পুঁজি দখল করতে চায় নতুন উপনিবেশ, ফলে সাম্রাজ্যবাদী জাতি-রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণকে ত্বরান্বিত করার জন্য যুদ্ধে যেতে থাকে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী জাতি-রাষ্ট্র তার দেশের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিকাশের স্বার্থকে রক্ষা করে।

লেনিন তাঁর বইতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের ৫টি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পুঁজিবাদ তার বিকাশের একটা নির্দিষ্ট ও অত্যন্ত উচ্চ স্তরে সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি হয়। পুঁজিবাদের থেকে উন্নততর সামাজিক ও অর্থনৈতিক একটি ব্যবস্থাতে পুঁজিবাদের রূপান্তরের যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে প্রকাশিত (''.....when the features of the epoch of transition from capitalism to a higher social and economic system had taken shape.....''.)। এ সময়ে পুঁজিবাদের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য তাদের বিপরীত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তিত হতে শু করেছে। যেমন—অবাধ প্রতিযোগিতা পরিবর্তিত হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্য একচেটিয়া কারবারে। লেনিন বলেন, ''.....imperialism is the monopoly stage of capitalism''। এ হল সাম্রাজ্যবাদের সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা, তবে লেনিন এ ব্যাপারে অবহিত যে খুব সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ম াত্রেই অসম্পূর্ণ। সব সংজ্ঞার মূল্যই শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক। তা স্বীকার করে নিয়ে তবেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদের ৫টি মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন। লেনিনের দেওয়া সংজ্ঞাটি হল ''Imperialism is capitalism in that stage of development in which the dominance of monopolies and finance capital has established itself; in which the export of capital has acquired pronounced importance; in which the division of the world among the international trusts has begun; in which the division of all territories of the globe among the biggest capitalist powers has been completed.''

লেনিন তাঁর সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। উল্লিখিত ৫টি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

(১) অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে সৃষ্টি হয় উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন। পুঁজিও উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন এত উঁচু স্তরে বিকাশ লাভ করেছে যে সে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করেছে। তারা অর্থনৈতিক জীবনে একটা নির্ধারক ভূমিকা নিচ্ছে। বিকাশের এক বিশেষ স্তরে, অবাধ প্রতিযোগিতা রূপান্তরিত হয় একচেটিয়া কারবারে। ফলে উৎপাদনের সামাজিকীকরণে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। বিশেষত, প্রকৌশলগত আবিষ্কার ও উন্নতির প্রক্রিয়ার সামাজিকীকরণ ঘটে। উৎপাদন সামাজিক হয়ে উঠলেও ভোগ-দখল বা আত্মসাৎকরণের চরিত্র ব্যক্তিগত রয়ে যায়। উৎপাদনের সামাজিক উপায়সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে স্ বীকৃত অবাধ প্রতিযোগিতার সাধারণ রূপরেখাটি থেকে যায়। কিন্তু কয়েকজন একচেটিয়া কারবারীর জোয়াল বাকি জনসমষ্টির ওপর চেপে বসে, শতগুণ ভারি হয়ে, অসহ্য বোঝা হয়ে। ২০ শতকের শুতে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে একচেটিয়া কারবারের চূড়ান্ত প্রাধান্য সম্পূর্ণ হয়। কাঁচা মালের সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ উৎসগুলে াকে দখলে উৎসাহী হয় একচেটিয়া কারবার। বিশেষত, পুঁজিবাদী সমাজের মৌলিক ও সবচেয়ে বেশি কার্টেলীকৃত শিল্পগুলোর জন্যে তার দরকার কয়লা ও লৌহ শিল্প। সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ কাঁচামালের উৎসের ওপর একচেটিয়া মালিকানা বৃহৎ পুঁজির ক্ষমতাকে প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি করেছে। কার্টেলীকৃত আর অ-কার্টেলীকৃত শিল্পগুলোর মধ্যেকার বৈরীমূলক দ্বন্দ্ব-কে তীব্র করেছে।

(২) ব্যাঙ্ক পুঁজির সাথে শিল্প পুঁজির মিলন ঘটে। মনোপলিগুলোর প্রকৃত ক্ষমতা বোঝা যায় ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকাকে বিবেচনা করলে। ব্যাঙ্কগুলোর প্রধান ও আদি ক াজ হল পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তীর ভূমিকা নেওয়া। কিন্তু নেহাত মিডলম্যানের থেকে ক্রমশ তারা প্রবল একচেটিয়া কারবারী হয়ে ওঠে। এদের হাতে সমস্ত পুঁজিপতিদের ও ছোট ব্যবসায়ীদের প্রায় সমগ্র অর্থ-পুঁজি (money capital) চলে আসে। একটা দেশের কাঁচা মালের উৎস ও উৎপাদন উপায়সমূহের বেশিরভাগও চলে আসে তাদের হাতে। অনেকগুলো দেশের ক্ষেত্রেও এটা ঘটে। এভাবে অসংখ্য সাধারণ মিডলম্যান থেকে মুষ্টিমেয় মনোপলিতে তারা পরিণত হয়। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদে ধনতন্ত্রের বিকশিত হবার এটি অন্যতম মূল প্রক্রিয়া। শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ব্যাঙ্কগুলোর সক্রিয় হস্তক্ষেপের গুত্ব বাড়ছে। শিল্পে ব্য াঙ্ক পুঁজি লগ্নী করার ফলে ক্রমশ ব্যাঙ্কার শিল্প-মালিক পুঁজিপতিতে পরিণত হতে থাকে। এই ব্যাঙ্ক পুঁজি অর্থাৎ অর্থের রূপে যে পুঁজিকে দেখা যাচ্ছে, তা শিল্প-পুঁজিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এটাই হল লগ্নী পুঁজি (Finance capital)। একে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাঙ্ক, কিন্তু কাজে ব্যবহার করে শিল্পপতি। অর্থাৎ উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন; তার থেকে মনোপলি; ব্যাঙ্কের সাথে শিল্পের মিলন—এভাবেই লগ্নী পুঁজির উদ্ভব। দেখা দেয় লগ্নীকারী গোষ্ঠীর প্রভুত্ব (Financial Oligarchy)। মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় লগ্নী পুঁজি। বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলো একচেটিয়া কারবার চালায়। লেনিন আরও বলছেন এই একচেটিয়া কারবারীরা জন-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তা সে সরকারের রূপ যাই হোক না কেন—''A monopoly, once it is formed and controls thousands of millions, inevitably penetrates into *every* sphere of public life, regardless of the forms of government and all other ''details'' ''। বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরশীলতার সম্পর্কজাল বিছিয়ে দেয় এই লগ্নিপুঁজি গোষ্ঠী।

(৩) লগ্নিপুঁজির সংযোগ ও নির্ভরতার যে আন্তর্জাতিক জাল তার সৃষ্টিতে পুঁজি রপ্তানি বিশেষ ভূমিকা নেয়। পুরনো ধনতন্ত্রে ছিল অবাধ প্রতিযোগিতা আর তার স াথে পণ্য বা মালপত্র রপ্তানি। কিন্তু ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিকতম পর্যায়ে (latest stage) রয়েছে একচেটিয়া কারবারীদের শাসন আর পুঁজি রপ্তানি। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ থেকে উদ্বৃত্ত পুঁজি অনগ্রসর দেশগুলোতে রপ্তানি করা হয়। সেখানে মুনাফা সাধারণত বেশি। কারণ পুঁজির বড় অভাব, জমির দাম তুলনামূলকভ াবে কম, মজুরি কম, কাঁচা মাল শস্তা। বিশ্ব পুঁজিবাদী আদানপ্রদানের প্রক্রিয়াতে বেশ কিছু অনগ্রসর দেশকে টেনে আনা গেছে বলেই এই পুঁজি রপ্তানি সম্ভব। সেসব দেশে রেলপথ চালু হয়েছে। শিল্প বিকাশের প্রাথমিক শর্তগুলো সৃষ্টি করা হচ্ছে। পুঁজি রপ্তানির দরকার হচ্ছে কারণ কয়েকটা মাত্র দেশে পুঁজিবাদ ''অতি-পরিপক্ক'' হয়েছে। কৃষিতে অনগ্রসরতা এবং জনগণের দারিদ্রের জন্যে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র পুঁজি খুঁজে পায় না। তাই মুষ্টিমেয় শিল্পোন্নত দেশ উপনিবেশে পুঁজি রপ্তানি করে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও জাতি এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়। সারা বিশ্বে ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রসারিত হয়, গভীরতর হয়। পুঁজি রপ্তানিকারী দেশ সর্বদা বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করে। লগ্নি পুঁজি তার সাথে যুক্ত বড় বড় শিল্প সংস্থাকে অর্ডার পাইয়ে দেয়, প্রভাব খাটায়

তাদের মুনাফার জন্যে। এভাবে লগ্নি পুঁজির জাল ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের সব দেশে। উপনিবেশে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলো এব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

(৪) আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতি জোট (combines) গড়ে ওঠে আর তাদের মধ্যে বিশ্ব ভাগাভাগি ঘটে। পুঁজি রপ্তানিকারী দেশগুলো জগতকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। তবে সেটা রূপকার্থে। কিন্তু লগ্নিপুঁজি সত্যিসত্যিই বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী জোট, কার্টেল, সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট নিজের দেশের বাজারকে সবার প্রথম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে কার্টেলগুলো। এই জোটগুলো দেশের শিল্পকে মোটামুটি সম্পূর্ণভাবে দখল করে ফেলে। কিন্তু পুঁজিবাদে দেশের বাজার বিদেশের বাজারের সাথে অনিবার্যভাবে বাঁধা থাকে। পুঁজিবাদ অনেক আগেই এক বিশ্ববাজার সৃষ্টি করেছিল। যতই পুঁজির রপ্তানি বাড়ল, যতই বিদেশি ও ঔপনিবেশিক সংযোগ বাড়ল, যতই বড় একচেটিয়া জোটের প্রভাবের এলাকা সবদিকে বাড়ল, ততই জোটগুলোর মধ্যেকার আন্তর্জাতিক চুক্তির দিকে, ততই আন্তর্জাতিক কার্টেল গঠনের দিকে, স্বাভাবিক প্রবণতা তৈরি হল। উৎপাদন ও পুঁজির বিশ্বব্যাপী ঘনীভবনের এ এক নতুন পর্যায়। এ হল সুপার-মনোপলি। বেসরকারি ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলো লগ্নি পুঁজির এই যুগে পরস্পর জোটবদ্ধ। আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলো দেখায় পুঁজিবাদী মনোপলিগুলো কোন্ পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী জোটের মধ্যে লড়াইয়ের ওরা লক্ষ্যবস্তু। বর্তমান অর্থনৈতিক লড়াইয়ের বিষয়বস্তু হল বিশ্বের ভাগাভাগি। লড়াইয়ের রূপ নিরন্তর বদলালেও তার বিষয়বস্তু, শ্রেণীগত অন্তর্বস্তু বদলায় না। পুঁজিপতিরা বিশ্বকে ভাগাভাগি করে নেয় কারণ কেন্দ্রীভবনের এই উচ্চ মাত্রায় মুনাফা পেতে গেলে এরকম ভাগাভাগি করতে তারা বাধ্য। পুঁজির ও শক্তির সমানুপাতিক হারে তারা এই ভাগাভাগি করে। পুনর্বিভাজনের সম্ভাবনাও সর্বদাই থেকে যায়।

(৫) বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে বিশ্ব ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়। বিশ্বকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী জোটগুলোর মধ্যে কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর সমান্তরাল ও এর সঙ্গে যুক্ত ঘটনা হল রাজনৈতিক জোটগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠা কিছু সম্পর্ক। অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক। তা গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্যে লড়াইয়ের ভিত্তিতে, অর্থাৎ উপনিবেশের জন্যে লড়াইয়ের জন্যে বা বিশ্বের ভূখন্ডগত ভাগাভাগির ভিত্তিতে। পৃথিবীর আর এমন কোনো ভূখন্ড নেই যা কার ভাগে নেই। তাই ভাগাভাগি সম্পূর্ণ। এখন কেবল পুনর্বিভাজন সম্ভব। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকের পর থেকে উপনিবেশ দখল বিরাট ভাবে বেড়ে যায়। বিশ্বের ভূখন্ডগত বিভাজন প্রচণ্ড গুরুত্ব পায়। স্পষ্টতই একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা লগ্নি পুঁজিতে ধনতন্ত্রের যে রূপান্তর তা বিশ্ব বিভাজনের লড়াই তীব্রতর হওয়ার সাথে যুক্ত। পশ্চিম ইওরোপীয় ধনতন্ত্রের বিকাশের প্রাক্-একচেটিয়া স্তর সম্পূর্ণ হয় ১৮৭৬ সালে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী জোটগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতিকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় উপনিবেশ দখল। পুঁজিবাদ যত বিকশিত হয়, কাঁচা মালের অভাব তত বেশি দেখা দেয়। প্রতিযোগিতা তত তীব্র হয়। সারা বিশ্বজুড়ে কাঁচামালের উৎসের খোঁজ বাড়ে। উপনিবেশ দখলের লড়াই তত বাড়ে। অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাময় কাঁচা মালের উৎসকেও লগ্নি পুঁজি গুরুত্ব দেয়। কারণ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন তার আয়ত্বে। দরকার হলে ব্যাঙ্ক দেবে বিশাল পুঁজি। লগ্নি পুঁজি তাই যত পারে ভূখণ্ড দখল করতে চায়। লগ্নি পুঁজির ভিত্তিতে যে নন-ইকনমিক উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে, তার রাজনীতি, মতাদর্শ—এসবই উপনিবেশ দখলে উৎসাহ জোগায়। অন্যান্য দেশগুলো পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ওপর বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্ন রূপে নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কিছু দেশ রূপান্তরকালীন পর্যায়ে থাকে। আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন। কিন্তু কার্যত, লগ্নি অর্থ (financial) ও কুটনীতির নির্ভরতার জালে তারা জড়িয়ে থাকে। লেনিনের মতে, একচেটিয়া কারবার বেড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে দিয়ে। ঔপনিবেশিক নীতির অসংখ্য পুরনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সাথে লগ্নি পুঁজি যুক্ত করেছে নতুন লক্ষ্য। তা হল কাঁচা মালের উৎসের জন্য লড়াই। পুঁজি রপ্তানির জন্যে লড়াই। প্রভাবের এলাকার জন্যে লড়াই (মুনাফাদায়ক কারবার, ছাড়, একচেটিয়াবাদী মুনাফা ইত্যাদির জন্যে প্রভাবের এলাকা)। আর সাধারণভাবে অর্থনৈতিক ভূখন্ডের জন্যে লড়াই। আগে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। যেমন ১৮৭৬ সালে আফ্রিকাতে ইওরোপীয় শক্তিগুলোর উপনিবেশ ছিল সেখানকার ভূখণ্ডের ১/১০ অংশ। তখন ঔপনিবেশিক নীতি একচেটিয়া কারবারের পদ্ধতি ছাড়া অর্থাৎ অন্যান্য পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করতে পারত। অর্থাৎ অবাধে ভূখন্ড দখল করে। কিন্তু ১৯০০ সালে আফ্রিকার ৯/১০ অংশ দখলীকৃত ছিল। সারা বিশ্বকে ভাগ করে নিয়েছে ওরা। তখন অনিবার্যভাবে উপনিবেশগুলোর একচেটিয়া মালিকানার যুগ এসেছে। ফলস্বরূপ, বিশ্বের বিভাজন ও পুনর্বিভাজনের জন্যে বিশেষভাবে তীব্র লড়াইয়ের যুগ এসে গেছে।

লেনিন-বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদের উপরোক্ত ৫টি বৈশিষ্ট্য কি আশ্চর্যজনক ভাবে আজও মূলত সমান মূল্যবান ও উপযোগী। আজকের সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এই ৫টি বৈশিষ্ট্যকেই আবার চিহ্নিত করতে বাধ্য হই, যদিও হয়তো তার এখানে ওখানে পরিবর্তনের কিছু কিছু ছাপ আমাদের নজর এড়ায় না। উল্লিখিত গ্রন্থের শেষের দিকে লেনিন আরও বলছেন, রাজনৈতিকভাবে, সাধারণভাবে ধরলে, সাম্রাজ্যবাদ হল হিংসা ও প্রতিক্রিয়ার অভিমুখে প্রবল প্রচেষ্টা। সে চায় অন্য ভূখন্ড দখল করতে, তা কৃষি অঞ্চল হোক বা শিল্পোন্নত। লেনিন বলছেন সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরজীবিতা। একচেটিয়া কারবার বলে এ গতিহীনতা ও ক্ষয়ের প্রবণতার জন্ম দেয়। একচেটিয়া কারবারে দাম প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। তাই এমনকি সাময়িকভাবে, প্রকৌশলগত (technical) অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কয়েকটি মাত্র দেশের হাতে অর্থ পুঁজি বিপুল পরিমাণে জমা হয়। ফলে উপসত্ত্বজীবী (rentier) একটি সামাজিক স্তরের বিশাল বৃদ্ধি ঘটে। তারা কাজ করে না। পুঁজি রপ্তানি তাদের উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বিদেশ ও উপনিবেশের শ্রম শোষণ করে সারা দেশ পরজীবীর চিহ্ন ধারণ করে। দেখা দেয় rentier state, সুদখোর রাষ্ট্র। আবার লেনিনের মতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সুবিধাভোগী অংশ সৃষ্টি করার ও তাদের প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার প্রবণতা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে থাকে। বিপুল একচেটিয়া মুনাফা লাভ করে বলে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের একাংশকে ঘুষ দিতে সমর্থ হয়। তাই শ্রমিক আন্দোলনে আসে সুবিধাবাদ। সাম্রাজ্যবাদের একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় নিপীড়ণ। লেনিন তাঁর বইয়ের শেষতম অধ্যায় ('The pস্তুন্তুন্দ স্দ্র নপ্লস্মান্দ্বজন্ত্রপ্তুন্দপ্ল ন্দ ড্রন্দদ্ধস্ক্জপ্তুঁপ্ল -তে বলছেন, অর্থনৈতিক সারবস্তুর দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ'। এটাই ইতিহাসে তার স্থানকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এর সৃষ্টি হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে একটি উচ্চতর সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে রূপান্তরিত করে। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বগুলোকে একচেটিয়া পুঁজি অতি তীব্র করে তুলেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় আর কার্টেলগুলোর স্বৈরাচার বেড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চোখে পড়ার মত বৈশিষ্ট্য এগুলো, যথা—একচেটিয়া কারবার, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর শাসন (oligarchy), স্বাধীনতার জন্যে প্রয়াসের পরিবর্তে প্রভুত্বের জন্যে প্রচেষ্টা, মুষ্টিমেয় সবচেয়ে ধনী বা সবচেয়ে ক্ষমতাবান জাতির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ক্ষুদ্র বা দুর্বল জাতির শোষণ। তাই সাম্রাজ্যবাদ হল মুমূর্ষু, পরজীবী ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ। এই ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতা অবশ্য পুঁজিবাদের দ্রুত বৃদ্ধিকে আটকায় না। শিল্পের কোন শাখা, বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন স্তর, কোন দেশ এইসব প্রবণতার কোনটাকে এখন বা অন্য কোনটাকে অন্য সময় প্রকাশ করে। সব মিলিয়ে পুঁজিবাদ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ছে। তবে এই বৃদ্ধি সাধারণভাবে অসম হয়ে পড়ছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, পুঁজি-সমৃদ্ধ ধনীতম দেশের ক্ষয়ের মধ্যে তা নিজেকে প্রকাশ করে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের সমগ্র বিশেষণ মূলত আজও প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুধু নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও। যুদ্ধ-পরবর্তী ঠান্ডা যুদ্ধের দীর্ঘ পর্যায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপন শুধু নয়, তার নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের ধুরন্ধর কলা-কৌশল। এমনকি সোভিয়েতের পতন-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি থেকে আজকের বিশ্বায়ন পর্যন্ত। লেনিনের নিপুন বিশ্লেষণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের মূল চরিত্রটিকে ধরা সম্ভব। একচেটিয়া পুঁজি, লগ্নীপুঁজি, ব্যাঙ্ক, কার্টেল, পুঁজি ও লগ্নি-পুঁজি রপ্ত

নি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিশ্বকে বিভাজন, বহুজাতিক সংস্থা, সাম্রাজ্যবাদী জাতি-রাষ্ট্রগুলোর বিরোধ ও যুদ্ধ, সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতিগুলোর নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম—এসব কথা আজকের বিশ্বেও, ইরাক যুদ্ধের প্রকৃতি অনুধাবন করতেও খুবই কার্যকর। তবু একই সাথে আমরা লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বে দুটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত; ১৯১৬ সালে লেনিন এই বই লিখেছিলেন। তারপরে এই দীর্ঘ প্রায় ৯০ বছরে বিশ্ব পুঁজিবাদের মধ্যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশেষত, বিশ্বায়নের বর্তমান পর্যায়ে এমন কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে যেগুলো লেনিনের তত্ত্বে ধরা পড়ে নি। ধরা পড়ার কথাও নয়। যদিও ঐ নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোর উদ্ভবের ফলে আজকের সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব পুঁজিবাদের মূল চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে গেছে মনে করি না। তবু, নতুন দিনের সাম্রাজ্যবাদকে ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে যথার্থ ভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই লেনিন-পরবর্তী নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করা দরকার। এভাবেই মার্কসবাদ (''not a dogma, but a guide to action'') সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলোকে আলোচনা করব।

দ্বিতীয়ত; লেনিনের তত্ত্বে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক আছে। অর্থনৈতিক কারণ, পুঁজিবাদ, উৎপাদন পদ্ধতি, শ্রেণীসম্পর্ক, বাজার, পুঁজি, লগ্নি পুঁজি—এগুলোর আলোচনাই গুরুত্ব পেয়েছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, জ্ঞানতত্ত্ব, ক্ষমতার কথা তেমনভাবে আসেনি। এই মহান তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী নিজেই ঐ গ্রন্থের প্রথমাংশে লিখেছেন—''Later on, we shall try to show briefly, and as simply as possible, the connection and relationships between the principal, economic features of imperialism. We shall not be able to deal with non-economic aspects of the question, however much they deserve to be dealt with'' (লেনিনের এই মন্তব্যটির প্রতি আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি শ্রী অনুপ ধরের কাছে ঋণী)। লেনিনের তত্ত্বের এই অভাব পূরণের জন্যে এই প্রবন্ধের শেষদিকে উত্তর আধুনিক দার্শনিক মিশেল ফুকোর ভাবনার সাহায্য নেব। এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের জ্ঞানতত্ত্ব ও সংস্কৃতি, যুক্তির শাসন, আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ও রাজনীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে উত্তর আধুনিক তত্ত্বের ধ্যান-ধারণা, বিশেষত ফুকোর অন্তর্দৃষ্টিকে আমরা ব্যবহার করব। এতে মার্কসবাদের শুদ্ধতা নষ্ট হবে না বরং তা আরো সমৃদ্ধ হবে। লেনিন ও ফুকোকে, মার্কসবাদ ও উত্তর আধুনিক তত্ত্বকে আমরা কোনো বাইনারিতে ফেলে দেখবো না, বরং তারা অতি-নির্ণীত (overdetermined)।

৩ আজকের নতুন বৈশিষ্ট্য

লেনিনের সময়কে পেছনে ফেলে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে যদি নতুন বৈশিষ্ট্য কিছু খুঁজি তো সবার প্রথমে চোখে পড়বে আজকের বিশ্বায়ন। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটে চলেছে বিশ্বায়ন। বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক অংশ পরস্পর-নির্ভর হয়ে পড়েছে। পণ্য আর পরিষেবা আদানপ্রদানের একটা বিরাট বাণিজ্যিক জালে জড়িয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা লক্ষ্যণীয় যে পুঁজিবাদ চিরকালই পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে নতুন নতুন বাজারের খোঁজে। সর্বত্র বাসা সে বাঁধে, সংসার সাজায়, সম্পর্ক পাতায়। প্রত্যেক দেশে পণ্য উৎপাদন আর সরবরাহ তার জাতীয় চরিত্র হারায়। হয়ে পড়ে বিশ্বজনীন (Cosmopolitan)। জাতীয় শিল্প ধ্বংস হয়। আসে নতুন শিল্প যার কাঁচামাল আসবে দূর দেশ থেকে। তার পণ্য বিক্রিও হবে দূর দেশে। ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে এসব কথা ছিল। তখনই এক অর্থে কিন্তু বিশ্বায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে তা বড় আকার নিয়েছিল। ইয়োরোপ থেকে উপনিবেশগুলোতে প্রচুর পুঁজি রপ্তানি হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত বিশ্বায়নে ভাঁটা চলছিল। আবার ১৯৮০-র দশক থেকে জোয়ার শুরু। বিশ্বায়ন নিয়ে আজকের উচ্ছাস তাই অনেকটাই বিশশতকের মধ্যভাগের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনার ফল। উনিশ শতকের সঙ্গে নয়। একইভাবে উনিশ শতক জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বেড়েছিল। বিশ শতকের মাঝখানে তা কমে আসে। আবার নতুন করে বাড়তে থাকে ১৯৭৫-এর পর থেকে। এসবই অবশ্য ইয়োরোপ-আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশের কথা। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ছবিটা অত পরিষ্কার নয়। বর্তমান বিশ্বায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত বিশালভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অভিবাসের কথা ধরলে দেখা যায় উনিশ শতকে যত লোক বিদেশে বসবাস করতে গিয়েছিল, বিশ শতকের শেষে অভিবাসীদের সংখ্যা সে জায়গায় পৌঁছোয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের পর্ব অবশ্যই বিশ্বব্যাপী পুঁজির বিকাশের এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। লেনিন দেখিয়েছিলেন সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অর্থলগ্নি পুঁজির বিশাল প্রভাব আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। আজকেও রয়েছে বিশ্ব পুঁজিবাদ, তার নিয়মে বিশ্বায়ন, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী জাতীয় রাষ্ট্রগুলো, তাদের মধ্যেকার বিরোধ।

কিন্তু এটা সত্যি যে আজকের পুঁজি ও জাতীয় রাষ্ট্র হুবহু আগের মতো আর নেই। এটা সত্যি যে ইতিমধ্যে পুঁজি ও রাষ্ট্রের চরিত্রে এমনই বিবর্তন ঘটে গিয়েছে যে আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও আজকের বিশ্বায়নের গুণগত তাৎপর্য আগের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। তবে আবারও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের লেনিন-বর্ণিত মূল কাঠামোটিকে মোটামুটিভাবে অবিকৃত রেখেই এই বিশ্বায়ন এখনও পর্যন্ত বিকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন একুশ শতকের গোড়ায় দেখা যাচ্ছে শিল্পপুঁজির চেয়ে বেশি মনোযোগ দাবি করছে আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার। আজকের বিশ্বায়নের প্রধান শর্ত হল দেশীয় অর্থলগ্নি ব্যবস্থার ওপর জাতীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আলগা করা। আন্তর্জাতিক মূলধন যাওয়া-আসার পথ খুলে দেওয়া। কমপিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি। এর ফলে ঘটে চলেছে আন্তর্জাতিক মূলধন বাজারের বিপুল প্রসার। ১৯৮০-র পর থেকে ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলোতে আর্থিক মূলধন জাতীয় উৎপাদনের তুলনায় আড়াই গুণ দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। বিদেশি মুদ্রা, বন্ড আর ইকুইটির ব্যবসা বেড়েছে ৫ গুণ দ্রুতহারে। অর্থাৎ শিল্পবিনিয়োগে নয়, স্টকবন্ড-মুদ্রা কেনাবেচায় পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে অনেক বেশি। সেখানে মুনাফা মিলছে দ্রুত, সবচেয়ে বেশি। আজকে সবচেয়ে বড় অর্থবাজার হল বিদেশি মুদ্রার বাজার। তা সত্যিই বিশ্বজনীন, গ্লোবাল। মার্কিন বন্ড বিক্রি বেড়ে চলেছে। ফলে বেড়ে চলেছে তার ঋণের বোঝা। কিন্তু তা নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা নেই। বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার হবার সুবিধে হল ঋণের বোঝা তার কাছে বোঝা নয়। বরং ক্ষমতা জাহির করার সুযোগ।

অবশ্য এই ফাটকা বাজার একান্তভাবেই অনুৎপাদক। তাছাড়া, মুদ্রা আর বন্ড নিয়ে ফাটকা খেলায় ঝুঁকি আছে। তবু আজকের পুঁজিতে যেন আবার সেই আদিম পুঁজিবাদের বিশ্বজয়ী জিঘাংসু মনোবৃত্তি ফিরে আসছে। তবে মনোবৃত্তি আদিম হলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে আজকের পুঁজি অনেক মার্জিত। ফাটকা বাজারের জুয়া খেলার বিজ্ঞানটা বোঝার চেষ্টা করছেন অর্থনীতিবিদরা। বিশ্ব জুড়ে শিল্প-উৎপাদনের তুলনায় ফাটকাবাজারের এই বিপুল স্ফীতি প্রকৃতই পুঁজির অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিনা তা নিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের মধ্যেও বিতর্ক আছে।

লেনিনের গ্রন্থটি লেখার আগে ও লেখার কালে, অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ায় আর আজকের মধ্যে আন্তর্জাতিক মূলধনের বাজার নিয়ে তুলনা করলে অন্তত তিনটি তফাত চোখে পড়ে (১) আজকে তথ্যপ্রযুক্তির গুণে মুদ্রা বা বন্ডের কেনাবেচা তৎক্ষণাৎ ঘটছে। একদিনের কেনাবেচায় মোট লেনদেনের সংখ্যাও আগের চেয়ে এখন বহুগুণ বেশি। ফলে একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে স্টক, বন্ড বা মুদ্রার দামের তারতম্যের সুযোগ নিয়ে ব্যবসার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়েছে। অন্যদিকে মূলধন আদান প্রদানের মোট ব্যবসা প্রতিদিন বিরাট আকারে বেড়ে চলেছে। (২) মূলধনের বাজারে কর্তৃত্ব করছে কয়েকটি বড় বড় অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান যথা—বীমা

কোম্পানি, পেনশন ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ডইত্যাদি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঞ্চয় জড়ো করে তা লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে এইসব প্রতিষ্ঠান। (৩) গত ২০-৩০ বছরে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবসায়িক প্রকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে। আগে খোলা বাজারে কেনাবেচা করা যেত না এমন বহু জিনিস নিয়ে এখন দৈনিক কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলেছে। যেমন—ডেরিভেটিভের ব্যবসা।

এবার দৃষ্টি ফেরাই শিল্পক্ষেত্রের দিকে। শিল্পপণ্যের ক্ষেত্রে গত ৩০ বছর ধরে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিশ্বায়ন চলেছে। একটি পণ্যদ্রব্যের বিভিন্ন অংশ নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় তৈরি হয়ে অন্যত্র অ্যাসেম্বল করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। মোটর গাড়ি, রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্প, ইলেকট্রনিক শিল্প—এগুলিতে বিশ্বায়ন এগিয়েছে। বস্ত্রশিল্পেও। হিসেব রাখা বা ক্লার্কের কাজ থেকে শু করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পরিষেবার কাজ বিভিন্ন দেশ থেকে সুবিধে মতো কম খরচে করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। একটি পণ্যদ্রব্যের কোনো অংশ তৈরি হচ্ছে জাপানে, অন্য কোনো অংশ ভারতের কোনো কারখানায়, আর একটি অংশ হয়তো আমেরিকায়। অ্যাসেম্বল হচ্ছে অন্য দেশে, বিপণন আর কোথাও।

অথচ মজার ব্যাপার হল এই যে একই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন আর পরিষেবা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। এর মানে কিন্তু কোম্পানির বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে তা মোটেই নয়। বিশ্বায়নের অঙ্গ হিসেবেই চলেছে নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা আহরণে কেন্দ্রীকরণ। উৎপাদন আর পরিষেবার টুকরো যত বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে ততই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দরকার হচ্ছে। সে নিয়ন্ত্রণ থাকছে সদর দপ্তর থেকে—শিল্পোন্নত দেশের বড় বড় শহরে—নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, টোকিও-তে। এরা হল গ্লোবাল সিটিজ্।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, আজ আর পুঁজি দাবি করে না যে সব ধরনের পণ্য বড় বড় কারখানায় অ্যাসেম্বলি লাইন পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে হবে। বস্তুত যে সব পণ্য তিরিশ বছর আগেও শিল্পোন্নত দেশের বড় কারখানায় তৈরি হত, আজ দেখা যাবে তা হয়ত সেই বহুজাতিক কোম্পানির তত্ত্বাবধানেই তৃতীয় দুনিয়ার কোনো দেশের গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প হিসেবে উৎপন্ন হচ্ছে। প্রযুক্তির বিকাশ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস, শ্রমের ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন, অর্থলগ্নি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার, ইত্যাদি নানা কারণের সংযোগে পুঁজি এখন অনেক নমনীয়। নানা ধরনের মিশ্রণ, সমন্বয়, সাংকর্য সে আজ নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে। প্রাক-ধনতান্ত্রিক বহু রীতি-নীতি আচার ব্যবহারের সাথে সে মানিয়ে চলতে শিখেছে। আজকের সর্বাধুনিক উৎপাদন সংস্থায় কর্মীদের হাজিরার হয়ত কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, অনেক কাজ হয়ত বাড়িতে বসেও করা যায়, কোথাও হয়ত বেশি রোজগারের লোভে কর্মীরা দিনে বারো-চোদ্দ ঘন্টা কাজ করছে। বিশ্বায়নের একটা ফল বোধ হয় এই যে শিল্পবিপ্লবের পর এই প্রথম বৃহৎ পুঁজির তত্ত্বাবধানে সারা পৃথিবী জুড়ে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকের তুলনায় অসংগঠিত, এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিক এত বেশি মাত্রায় পুঁজির উৎপাদন বৃত্তের আওতায় আসছে। শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে আমরা পড়েছিলাম কারখানার শ্রমিকের কাজের সময় আইন করে বেঁধে দেওয়া, তার ন্যূনতম মজুরি স্থির করে দেওয়া, এসব পুঁজির অগ্রগতির স্বার্থেই ঘটেছিল। আজকের পুঁজি তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথ খুঁজতে গিয়ে মনে করছে, সেসব আইন-কানুন ইতিহাসের শৃঙ্খল। তাকে একেবারে ছুঁড়ে ফেলতে না পারলেও, যেখানে সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

সুতরাং বলতে পারি সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রবল উপস্থিতির পাশাপাশি নমনীয় পুঁজি, নমনীয় সার্বভৌমত্ব—দুই-এ মিলে আজ সৃষ্টি হয়েছে নমনীয় সাম্রাজ্য ব্যবস্থা যা সাময়িক ও স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে নিজের শাসন পন্থার অদল বদল করে নিতে পারে, নতুন নতুন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সুতরাং প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি সাম্রাজ্যের নমণীয় শাসননীতির প্রত্যুত্তর হিসেবে সমান নমনীয়, মিশ্র, পরিবর্তনশীল সাম্রাজ্যবিরোধী রাজনীতি। এ দুই রাজনীতির মধ্যে কোনো বাইনারি নেই। বরং তারা পরস্পর অতি-নির্নীত (overdetermined)। বর্তমান বিশ্বায়নের অন্যতম গুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তার প্রবল অভিঘাত গিয়ে পড়ছে সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের ভূখন্ড-ভিত্তিক সীমানার ওপর। বিশ্ব অর্থনীতি সব দেশের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব আন্তর্জাতিক মূলধননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর। এরূপ পুঁজি অতি দ্রুতগামী। অনায়াসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে সক্ষম। ফলে যে দেশ বিদেশি মূলধনের ওপর বেশি নির্ভরশীল, আন্তর্জাতিক মূলধন-প্রতিষ্ঠানগুলি সে দেশ থেকে চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে তাদের পছন্দসই নীতি আদায় করে নিতে পারে। আর্থিক বিপদে পড়লে সাহায্যের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক ঋণ প্রতিষ্ঠানের শর্ত মেনে নিতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব খর্ব হচ্ছে। অথচ বিশ্বায়ন থেকে দূরে থাকলেও বিরাট ক্ষতি।

প্রাথমিকভাবে হয়ত কোনো রাষ্ট্র বিশ্বায়নকে ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারে। রাষ্ট্র তার আইনের জোরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব বাজার বা আন্তর্জাতিক পুঁজির হাত থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ক্রমশ বাজেট ঘাটতি, মূল্যবৃদ্ধি, জাতীয় ঋণের বোঝা, বিদেশি মুদ্রার অভাব এসব সমস্যা থেকে সংকট দেখা দেয়। তখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য দরকার হয়। বন্ধ জানালা খুলতেই হয়। বিশ্বায়ন দেশের লোককে আকর্ষণ করে। অভিজাত ও মধ্যবিত্তরা দাবি করে জীবনযাত্রা ভোগ্যসামগ্রীর মান বাড়াও, বিশ্ববাণিজ্যে যোগ দাও, প্রযুক্তি আনো। সমাজতান্ত্রিক দেয়াল দিয়ে যে অর্থনীতিকে চীন দীর্ঘকাল ঘিরে ও আগলে রেখেছিল, বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় যোগ দেবার জন্যে তার আকুতি তো সাম্প্রতিককালের ঘটনা। এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে বিশ্বায়নকে বর্জন করা বোকামি? ঠিকই। আবার উল্টোদিকে তেমনি নির্বিচারে গ্লোবালাইজেশনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় নয়। আজকের বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য এটাই যে তার মধ্যে গিয়েই জাতীয় রাষ্ট্র তার আপন জাতীয় স্বার্থে বিশ্বায়নের মোকাবিলা, তার ওপর চাপ সৃষ্টি, তাকে কাজে লাগানো, দর-কষাকষি ও তার গতিপথকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে, আজকের বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। কমপিউটার, ইনটারনেট, ই-মেল, ই-কমার্স, ভারচুয়াল রিয়ালিটি, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ অতি উন্নত প্রযুক্তির টেলিকমিউনিকেশান ইত্যাদি সারা বিশ্বকে একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে। তথ্য বিস্ফোরণের যুগে, মানব-চৈতন্যে খন্ডীকরণ প্রক্রিয়া অতি সক্রিয়। লিওতার, ডেভিড হার্ভে প্রমুখেরা এই পরিস্থিতিকে উত্তর আধুনিক অবস্থা (পোস্টমডার্ন কন্ডিশান) বা উত্তর-আধুনিকতা (পোস্টমডার্নিটি) বলে বর্ণনা করেছেন।

এটাও লক্ষণীয় লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিষয়ক গ্রন্থটি লেখা হয় ১৯১৬ সালে। তারপরে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বব্যাপী সংস্থা, লীগ অফ নেশন্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫-এ গঠিত হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ; আর তারপরে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক ইনটার-স্টেট সংস্থাগুলি, টি. এন. সি., এম. এন. সি., অতি-জাতীয় সংগঠন ইত্যাদি। কোনোটি অর্থনৈতিক, কোনোটি সামরিক, কোনোটি হয়ত বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে—ন্যাটো, সেন্টো, সিয়াটো, কোমেকন, আরব লীগ, ন্যাম, সার্ক, ওয়ারশ চুক্তি জোট, ও. এ. ইউ., ওপেক, ই. ই. সি., ই. সি., আনজুস, আসিয়ান, গ্রুপ অফ সেভেন্টি-সেভেন, জি-৭ থেকে শু করে আজকের প্রবল প্রতাপশালী ডবলিউ. টি. ও., জি-৮। এর মধ্যে কয়েকটি আর নেই। আবার W.T.O. হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বায়নের তত্ত্বাবধায়ক, তার অসংখ্য পেটেন্ট আইন, মেধা সংরক্ষণ ও বৌদ্ধিক সম্পদ আইন, বাণিজ্যিক নিয়ম, শিল্প উৎপাদন আইন, চুক্তিসমূহ নিয়ে। সাথে তার বিশ্বব্যাঙ্ক, I.M.F.।

আর এর সাথে লক্ষণীয়, বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের পাশাপাশি নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো ব্যাপ্তি লাভ করে চলেছে। এইসব নিউ সোসাল মুভমেন্টস্ কখনও পরিবেশ দূষণের বিদ্ধে, কখনও বিশ্বায়নের বিপক্ষে কখন বা লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রতিবাদে, যুদ্ধ ও পরমাণু দূষণ প্রতিরোধে; আবার কখন বা প্রান্তিক মানুষ, যথা—যৌনকর্মী, সমকামী, উভলিঙ্গ, উচ্ছেদ হওয়া, বাস্তুচ্যুত, পথশিশু, রাষ্ট্রহীন মানুষ—এঁদের দাবি নিয়ে ঘটছে। সংখ্যালঘুর, আদিবাসী মানুষের, দলিত ও নিম্নবর্ণের, কৃষ্ণকায় মানুষের অধিকারের লড়াই গড়ে উঠছে। বিভিন্ন আত্ম-পরিচয় (Identity)-ভিত্তিক, স্থানিক, খন্ডিত, কেন্দ্রীয় সংগঠন-বিহীন এসব

প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ গুত্ব পাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও শ্রেণী-ভিত্তিক সংগ্রামের পাশাপাশি লিঙ্গভেদ, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, ধর্মীয় নিপীড়ন, নিপীড়িত জাতিসত্ত্বা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রশ্নকে ঘিরে এই আন্দোলনগুলি ছড়িয়ে পড়ছে।

লেনিন-বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ আজ যেমন ভীষণভাবে উপস্থিত, অন্তত তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ে, তেমনি আজ এটাও সত্যি যে পুঁজি ও রাষ্ট্রের চরিত্রে কিছু গুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। এক কথায় বললে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে এই কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র; নমনীয় পুঁজি, নমনীয় সাম্রাজ্য ও নমনীয় সার্বভৌমত্ব; শেয়ার বাজারের গুত্ব; বিশ্বায়ন; তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব; অতি-জাতীয় সংস্থাগুলোর ভূমিকা; নতুন সামাজিক আন্দোলন আর শ্রেণী-সংগ্রাম। এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য—এ দুটিকে বাইনারি হিসেবে ভাবা ভুল হবে। বরং তারা পরস্পর অতি-নির্ণীত। কোন্‌টি কারণ ও কোন্‌টি ফল, কোন্‌টি নির্ধারক ও কোন্‌টি নির্ধারিত, কোন্‌টি প্রধান ও কোন্‌টি অপ্রধান এ প্রশ্নের আগে থাকতে পূর্ব-নির্ধারিত কোনো উত্তর হয় না। পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সংগ্রাম স্থির করে দেবে কোনো বিশেষ সময়ে, স্থানে ও পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর কী হবে।

৪ 'সাম্রাজ্য' একটি নমনীয় মূল্যায়ন

মার্কিন প্রজাতন্ত্র নিজে সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে লড়াই করে। সেদেশেই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের সার্বভৌমত্ব। তাই সাম্রাজ্যবাদী বললে তারা ক্ষুব্ধ হত। গত ১০/১২ বছরে সবকিছু পালটে গেছে। এখন আমেরিকার রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, চিন্তাবিদরাই বলছেন, অস্বীকার করে লাভ নেই। এ হল সাম্রাজ্য। পুরনো ধ্যান-ধারণা ছেড়ে আজ তাই বিচার করা দরকার, সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্যে কী করা উচিত। শুধু যে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলরাই একথা বলছেন তা নয়। তাঁরা বরং কম বলছেন। কারণ তাঁরা অনেকেই এই নতুন দুনিয়ার প্রকৃতি বুঝে উঠতে পারেন নি। উদারপন্থীরাই সবচেয়ে বেশি করে বলছেন এই নতুন সাম্রাজ্যের কথা। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতালির প্রথা-বিরোধী মার্কসবাদী বিপ্লবী ও তাত্ত্বিক আনতোনিও নেগ্রি ও তাঁর মার্কিন সহযোগী মাইকেল হার্ট-ও নতুন 'সাম্রাজ্য'-এর ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের এমপায়ার (২০০১) গ্রন্থে। বইটি বিশেষত বিশ্বায়ন বিরোধী কর্মীদের কাছে গুত্ব পেয়েছে। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের ধারণার বিপরীতে হার্ট ও নেগ্রি তাঁদের 'সাম্রাজ্য' ধারণা এনেছেন। আমরা মূলত লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ ধারণাকে প্রাসঙ্গিক মনে করি। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা নেগ্রি ও হার্টের সাম্রাজ্য ধারণাকে বিশ্লেষণ করে তার কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা দেখতে চাই। প্রথমত, মার্কসবাদের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক ছিল। তার বিপদ সম্পর্কে আমরা সচেতন। দ্বিতীয়ত, বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতিমধ্যে অনেক গুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেগুলো লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বে না ধরা পড়ারই কথা। তৃতীয়ত, আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের ব্যাখ্যায় মার্কসবাদ বিশেষ গভীরতার পরিচয় দেয় নি। এসব ক্ষেত্রে নেগরি ও হার্টের 'সাম্রাজ্য' ধারণা থেকে আমাদের কিছু নেওয়া সম্ভব কিনা দেখতে হবে। এমনও হতে পারে যে নেগ্রি ও হার্টের 'সাম্রাজ্য' ধারণা হয়তো লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' ধারণার বিকল্প কিছু দিতে না পারলেও তার পরিপূরক ভূমিকা নিল। এমন অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যার তাত্ত্বিক মোকাবিলা প্রথাগত ও ধ্রুপদী মার্কসবাদ দিয়ে সম্ভব নাও হতে পারে। কোনোরকম গোঁড়ামি ও অন্ধতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ''concrete analysis of concrete situation'' ছিল লেনিনের চোখে মার্কসবাদের সার-নির্যাস। তাঁর এই শিক্ষাকে অনুসরণ করে আজকের বিশ্ব ক্ষমতা পরিস্থিতির মূর্ত্ত বিশ্লেষণ আমাদের লক্ষ্য। বিশ্লেষণ থেকে পরিবর্তনের প্রয়াস, প্রয়াস থেকে ব্যর্থতা। তবু আবার বিশ্লেষণ, বিতর্ক, পরিবর্তনের জন্যে অনুশীলন, আবার ব্যর্থতা। ব্যর্থতা অনেক, সাফল্য সামান্য। তবু আবার বিশ্লেষণ...এভাবেই তো চলে, চলার কথা। সাম্রাজ্যবাদ থেকে সাম্রাজ্য? সাম্রাজ্যবাদ অথবা সাম্রাজ্য? নাকি সাম্রাজ্য থেকে ফিরে আসা সাম্রাজ্যবাদে? নাকি সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্য? (এখানে উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন যে স্থানাভাবে নেগ্রি ও হার্টের বইয়ের সব দিক নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না। শুধু প্রাসঙ্গিক দিকগুলোতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।)

নেগ্রি ও হার্ট বলছেন, সাম্রাজ্যবাদ আর নেই। আধুনিক ইওরোপীয় জাতিগুলো যেভাবে ছিল সেভাবে কোনো জাতিই আর বিশ্বনেতা হতে পারবে না। আমরা বর্তমানে এক উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করেছি। সাম্রাজ্যবাদ রূপান্তরিত হয়েছে সাম্রাজ্যে। সাম্রাজ্য এখানে কোনো মেটাফর নয়। বরং একটি ধারণা যা প্রাথমিকভাবে একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দাবি করে। নেগরি ও হার্ট নতুন সাম্রাজ্যের ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক যুগ জুড়ে ইওরোপীয় শক্তিগুলো যেসব সাম্রাজ্যবাদ গঠন করেছিল তাদের ভিত্তি-প্রস্তরটি ছিল জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু ''সাম্রাজ্য' হল 'সাম্রাজ্যবাদ' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেমন এই সাম্রাজ্য? এ সাম্রাজ্য রাজ্য দখল করে না। পরাজিত দেশের ওপর নিজের প্রশাসন বা রাজস্বব্যবস্থা বসায় না। একান্ত প্রয়োজন না হলে সৈন্য পাঠায় না। আজ আমেরিকা কেন, বাস্তবিকপক্ষে কোনো জাতি-রাষ্ট্রের পক্ষেই একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রজেক্টের কেন্দ্র গঠন করা সম্ভব নয়। এ হল বিশ্বজনীন সাম্রাজ্য। এ হল এক নতুন সাম্রাজ্য যার সীমান্তগুলো উন্মুক্ত, প্রসারমান। যেখানে ক্ষমতা কার্যকরভাবে বন্টিত হবে বিভিন্ন তন্তুজালিকা (network)-এর মধ্যে।

সেকেলে উপনিবেশবাদে একদেশের (ব্রিটেন) জনগন অন্য দেশের (ভারত) জনগণের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করত। এ সাম্রাজ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এর সীমানা নেই। সাম্রাজ্যের শাসনের কোনো সীমা নেই। পার্থ চট্টোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করছেন, যখন মার্কিন নৌজাহাজ থেকে মিসাইল গিয়ে পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেড শহর গুঁড়িয়ে দিল, তখন কেউ দাবি করেনি যে মার্কিন জনগণ সার্বিয়ার অধিবাসীদের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। সার্বিয়া সরকার যখন যুদ্ধে হার মানল, তখনও মার্কিন পক্ষ ভাবে নি যে এবার সার্বিয়াতে মার্কিন প্রশাসন চালু হবে। মার্কিন পতাকা উড়বে। বা রাস্তায় মার্কিন সেনা টহল দেবে। বরং তাদের চিন্তা ছিল, কত তাড়াতাড়ি মার্কিন সৈন্য ফেরত আনা যাবে। নেগ্রি ও হার্ট বলছেন, যদিও সাম্রাজ্যের ব্যবহারিক অনুশীলন বারে বারে রক্তে ভিজেছে, সাম্রাজ্যের ধারণা কিন্তু সর্বদাই শান্তির প্রতি উৎসর্গীকৃত থেকেছে। তা হল ইতিহাসের বাইরে এক নিরবচ্ছিন্ন ও বিশ্বজনীন শান্তি। ঠান্ডা লড়াইয়ের পারস্পরিক ভয় দেখানোর দিন শেষ। এখন সারা বিশ্বে শান্তিরক্ষা করতে পারে এই সাম্রাজ্য। তার প্রথম ও প্রধান কাজ শান্তিরক্ষা। একমাত্র ন্যায্য, যুক্তিসিদ্ধ, সর্বজনগ্রাহ্য শক্তি যা বিশ্বময় শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তা হল সার্বভৌম সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্য যুদ্ধ করবে না, তার কোনো প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, শত্রু নেই। সে যুদ্ধে যাবে কার বিদ্ধে? সে তার সামরিক বল ব্যবহার করবে শুধু শান্তিরক্ষার জন্যে। নেগ্রি এবং হার্টের মতে, ঠান্ডাযুদ্ধ স্তিমিত হয়ে পড়লে সেইসব বছরগুলোতে এবং অবশেষে ঠান্ডাযুদ্ধ শেষ হলে তার অব্যবহিত পরের বছর গুলোতে, একটি আন্তর্জাতিক পুলিশী ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব পড়ল আমেরিকার জুতসই কাঁধের ওপরে। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকা সর্বপ্রথম এই ক্ষমতাকে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করল। আমেরিকান সেনা আজ পৃথিবীর সেরা পুলিশ বাহিনীর কাজ করার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। মার্কিন বিশ্ব পুলিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কাজ করে না। সে কাজ করে সাম্রাজ্যের স্বার্থে। অর্থাৎ যুদ্ধ নয়। দুনিয়া জুড়ে পুলিশের কাজ করবে সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী। প্রয়োজনে সে বলপ্রয়োগ করবে, পুলিশকেও তো বলপ্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু ন্যায্য উপায়ে, আইন মেনে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। শুধু ততটুকুই সে বলপ্রয়োগ করবে যতটুকু প্রয়োজন। অহেতুক খুন-জখম করলে আমরা পুলিশকে দোষ দিই। সাম্রাজ্যের শান্তি-রক্ষার বেলাতেও একই নিয়ম। মার্কিন সৈন্য বিদেশে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ হারাচ্ছে, মার্কিন জনগণ তা আজকাল মোটেই মেনে নিতে রাজি নয়। সাদ্দাম হোসেন, মিলোসেভিচ বা লাদেনকে তারা গুন্ডা-বদমাস বলে ভাবতে রাজি আছে, দেশের শত্রু বলে নয়। গুন্ডা-বদমাসদের শায়েস্তা করতে হলে তাদের পুলিশ দিয়ে জেলে পুরতে হয়। প্যালেস্টাইন সঙ্কটে, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার খন্ডগুলোর অশান্তিতে, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাক বিরোধে শোনা যাচ্ছে প্রয়োজন এমন এক সার্বভৌম শক্তি যে বিবাদমান পক্ষগুলোকে এক টেবিলে বসিয়ে সই করাতে পারবে।

নেগ্রি ও হার্টের এই নতুন 'সাম্রাজ্য' গণতান্ত্রিক। সাম্রাজ্য, অথচ সম্রাট নেই। জনগণের সার্বভৌমত্ব এখানে স্বীকৃত নীতি। প্রজারাই এখানে রাজা। গণতন্ত্রে যেমন হওয়া উচিত। কিন্তু সেজন্যেই সাম্রাজ্যের কোনো ভৌগলিক সীমা নেই। আগেকার দিনের মতো যুদ্ধে জিতে, দেশ দখল করে সাম্রাজ্যের আয়তন বাড়ানোর দরকার নেই। সাম্রাজ্য বাড়ছে কারণ শান্তির আশায়, সমৃদ্ধির লোভে নানা দেশের মানুষ, এমনকি সে সব দেশের সরকার, সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেতে চাইছে। সাম্রাজ্য তাই ভূখন্ড দখল করে না। সম্পত্তি ধবংস করে না। নতুন নতুন দেশকে সে নিজের ক্ষমতাতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। তাতে জায়গা করে দেয়। সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মূলমন্ত্র শক্তি নয়, নিয়ন্ত্রণ। শক্তির সীমা আছে। নিয়ন্ত্রণের কোনো সীমা নেই। তাই সাম্রাজ্যের আদর্শ হল বিশ্বজনীন প্রজাতন্ত্র। এ হল বিশ্বজনীন সার্বভৌম সাম্রাজ্য। তবে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের থেকে তা আলাদা। এই সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীর ভূখণ্ডের ওপর মালিকানা দাবি করছে না। এক একটি দেশের এলাকা আর তার অধিবাসীদের ওপর সে দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এমন সরকারই শাসন করবে—এটাই বাঞ্ছিত নীতি। সকলের সংবিধান বা শাসনপদ্ধতি এক হতে হবে, এমনও নয়। সাম্রাজ্য মোটেই সারা বিশ্বময় অভিন্ন সাদৃশ্য দাবি করছে না। তার মূলমন্ত্র নিয়ন্ত্রণ, দখল নয়, আত্মসাৎ করা নয়।

এখানে এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের ওপর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে না। সাম্রাজ্যই সার্বভৌম। নেগ্রি ও হার্টের মূল বক্তব্য হল সার্বভৌমত্ব একটা নতুন রূপ নিয়েছে। একটি একক শাসন-যুক্তি (logic of rule)-র অধীনে ঐক্যবদ্ধ সারি সারি জাতীয় ও অতি-জাতীয় (supranational) অরগানিজম নিয়ে এটি গঠিত। অরগানিজম মানে অবিচ্ছেদ্য অংশ সমষ্টির ব্যবস্থা (organism)। ঐ সব ব্যবস্থায় অংশগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত শুধু তাই নয়, তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলও বটে। অংশগুলির সমষ্টি হিসেবে ব্যবস্থা গঠিত। এ যেন এক সামগ্রিক সত্তা। তারা কেউ কেউ জাতীয়, আবার কেউ কেউ অতি-জাতীয়। এগুলো একটি শাসন-যুক্তি দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত। আজকের সার্বভৌমত্ব এগুলো দ্বারাই গঠিত। সার্বভৌমত্বের এই নতুন বিশ্বব্যাপী রূপকেই নেগ্রি ও হার্ট বলছেন সাম্রাজ্য (Empire)। আধুনিক সার্বভৌমত্বের গোধূলি থেকেই সাম্রাজ্যের দিকে যাত্রা শুরু। সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে, সাম্রাজ্য ক্ষমতার কোনো ভূখন্ডগত কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করে না। অপরিবর্তনীয় সীমানা বা বাধার প্রাচীরের ওপর সে নির্ভর করে না। এ হল একটা বি-কেন্দ্রায়িত (decentered) এবং বি-ভূখণ্ডীকরণ-কারী (deterritorializing) শাসন-যন্ত্র। তার উন্মুক্ত, প্রসারশীল সীমান্তের মধ্যে সে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে সমগ্র বিশ্ব রাজত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সঙ্কর আত্ম-পরিচয় (hybrid identities) নমনীয় উচ্চ-নীচ স্তর-কাঠামো (hierarchy) এবং বহুত্ববাদী বিনিময় চালিয়ে যায় এই সাম্রাজ্য। আদেশের তন্তুজালের ওঠা-নামাকে সে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মানচিত্রের সুস্পষ্ট জাতীয় রঙগুলো সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী রামধনুর মধ্যে মিশে গেছে, মিলে গেছে।

সাম্রাজ্য হল বিশ্বায়নের নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের বাধা মুক্ত হয়ে বিশ্ব বাজার অবাধে চলছে। তার উপযোগী সার্বভৌম ব্যবস্থা—সাম্রাজ্য। এই নতুন বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্বের গঠনতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি (constitutionalisation) সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবই অপ্রতুল। কারণ সেসব তত্ত্ব জাতি-রাষ্ট্র গঠনের যে তাত্ত্বিক মডেল হবস ও লক দিয়েছিলেন তার মধ্যেই আটকে আছে। নেগ্রি ও হার্টের মতে বিশ্ব পরিস্থিতিতে একটা নতুন উপাদান দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে একটা ঐতিহাসিক প্যারাডাইম শিফ্‌ট ঘটে গেছে। তাঁদের ক্ষোভ যে বহু সমসাময়িক তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। সেটা হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিশ্বায়ন ও তার বিশ্ব বাজার একটা মূলগতভাবে নতুন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। তার ফলে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক শিফ্‌ট ঘটে গেছে। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা-সম্পর্কে যে একটা বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে সেটা স্বীকার করতে তাত্ত্বিকরা অনাগ্রহী। কারণ এই সব তাত্ত্বিক মনে করেন যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও অন্যান্য জাতির ওপর প্রাধান্যকারী (dominant) পুঁজিবাদী জাতি-রাষ্ট্রগুলি আজও সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব (domination)-এর প্রয়োগ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্নতার এইসব বাস্তব ও উল্লেখযোগ্য যোগসূত্রকে খাটো করে না দেখে বরং উচিত অন্য কিছু ব্যাপারকে মাথায় আনা। যেমন আগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে যেসব বিরোধ ও প্রতিযোগিতা ছিল সেসব বেশ গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে একক একটি ক্ষমতার ধারণার দ্বারা। ঐ ক্ষমতা তাদের সবাইকে অতি-নির্ণয় (overdetermine) করে। একধর্মী (unitary) রূপে কাঠামো দান করে তাদের। অধিকারের একটাই সাধারণ অভিন্ন ধারণা দিয়ে তাদের বিবেচনা করে। ঐ ধারণা সুনিশ্চিতভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক ও উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী।

নেগ্রিদের মতে, উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রাথমিক ফ্যাক্টরগুলি অর্থাৎ অর্থ, প্রযুক্তি, জনসাধারণ ও মালপত্র এখন জাতীয় সীমানাকে অতিক্রম করে চলাচল করছে। যতদিন যাচ্ছে এটা তত সহজ হচ্ছে। এই চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা জাতি-রাষ্ট্রের কমছে। অর্থনীতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতাও তার কমছে। এমনকি সবচেয়ে প্রভুত্বকারী (dominant) জাতি-রাষ্ট্রগুলোকেও আর চূড়ান্ত ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব বলে ভাবা যাচ্ছে না। সে তাদের নিজেদের সীমানার মধ্যে বা বাইরে যাই হোক না। তথ্য বিপ্লবের জন্যে বিশ্ব বাজার এতটাই বিশ্বায়িত হচ্ছে যে জাতি-রাষ্ট্র তাকে আর প্রভাবিত করতে অক্ষম। জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অপসৃত হচ্ছে। এই সার্বভৌম-ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের স্থলে উদ্ভূত হচ্ছে সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের হাতে পীড়ন ও ধবংসের বিপুল ক্ষমতা আছে। তবে সাম্রাজ্যবাদ অর্থাৎ প্রভুত্বের (domination) পুরনো রূপ থেকে সাম্রাজ্যের দিকে যাত্রা এবং এর বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াগুলো মুক্তিকামী শক্তিগুলোর সামনে নতুন সম্ভাবনা এনেছে। আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য শুধু এই প্রক্রিয়াগুলোকে রোধ করা নয়। বরং তাদের পুনঃ সংগঠিত করা, নতুন লক্ষ্যের দিকে তাদের পুনঃ চালনা করা।

নেগ্রি ও হার্টের মতে, সাম্রাজ্য জন্মেছে একটা সঙ্কট হিসেবে। সঙ্কট হিসেবেই সে প্রতীয়মান। কীভাবে এই সঙ্কট ঘুচবে? এ প্রসঙ্গে তাঁরা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে খ্রীষ্টধর্মের জন্মের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা টেনেছেন। বলেছেন, নতুন সাম্রাজ্যের অধিকারের সীমানা ও মীমাংসার অতীত সমস্যাগুলো যেহেতু অপরিবর্তনীয় ও স্থির, তত্ত্ব ও প্রয়োগ তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার একবার বৈরীমূলক দ্বন্দ্বের একটা সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) ভিত্তি পাওয়া সম্ভব। সেটা সাম্রাজ্যের মধ্যে। শুধু মধ্যে নয়—সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যকে ছাড়িয়েও, সমগ্রের একই স্তরে (at the same level of totality)। সাম্রাজ্যের ধারণা এমন একটা রাজত্ব (regime)-কে বোঝায় যেটা কার্যকরভাবে স্থানগত সমগ্রতা (spatial totality)-কে ধারণ করে। অথবা, সমগ্র 'সভ্য' পৃথিবীর ওপর সে প্রকৃতই শাসন চালায়। ইতিহাসের গতিশীলতার একটি স্বল্পস্থায়ী মুহূর্ত হিসেবে সাম্রাজ্য নিজের শাসনকে উপস্থিত করে না, বরং এমন একটা রাজত্ব হিসেবে করে যার সময়গত সীমানা বলে কিছু নেই। এই অর্থে এই সাম্রাজ্য ইতিহাসের বাইরে বা ইতিহাসের শেষে। দেশ-বিজয়ের মধ্যে থেকে উদ্ভূত একটি ঐতিহাসিক রাজত্ব হিসেবে সাম্রাজ্যের ধারণা নিজেকে উপস্থাপিত করে না। বরং এমন এক ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপিত করে যা কার্যকরীভাবে ইতিহাসকে স্থগিত রাখে এবং চলতি ঘটনা-পরিস্থিতিকে চিরন্তন করে তোলে। সাম্রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিত থেকে, সবকিছু সর্বদা ঠিক এইরকমই থাকবে এবং সর্বদা ঠিক এইরকমই তাদের থাকার কথা।

সাম্রাজ্যের উদ্ভবকে বিচার-সম্বন্ধীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখার পরে হার্ট ও নেগ্রি নেমে এসেছেন বাস্তবতা (materiality)-র স্তরে। শাসনের প্যারাডাইমের বাস্তব রূপান্তর সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান করলেন। এক্ষেত্রে মিশেল ফুকো, দ্যলুজ ও গুয়াত্তারির মতো উত্তর আধুনিক চিন্তাবিদদের ভাবনার তাঁরা সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা বায়োপলিটিক্যাল পাওয়ারের কথা বলেছেন। এ ক্ষমতা স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণকারী (self-regulating) ও ভেতর থেকে স্বয়ং-পুনৎপাদনকারী (self-reproducing from within)। এই বায়ো-পলিটিকাল সমাজ ব্যবস্থা দিয়ে সাম্রাজ্য গঠিত। নেগ্রি ও হার্টের মতে, কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে, বিশ

াল ট্রান্স ন্যাশনাল কর্পোরেশন (টি. এন. সি.) গুলো বায়ো-পলিটিক্যাল দুনিয়ার মৌলিক সংযোগরক্ষাকারী বুনোট বা কাঠামোকে নির্মান করে। পুঁজিকে সর্বদাই সংগঠিত করা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপী ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু কেবল বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বহুজাতিক ও ট্রান্সন্যাশনাল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও ফিনান্শিয়াল কর্পোরেশানগুলি বিশ্বের ভূখন্ডগুলিকে বায়োপলিটিক্স-এর দিক থেকে কাঠামোরূপ দান করতে থাকে। শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা (order)-র বায়োপলিটিক্যাল উৎপাদনকে আমরা যেসব ক্ষেত্রে চিহ্নিত করতে পারি তার একটা হল প্রতীকী (the symbolic), যোগাযোগ এবং ভাষা উৎপাদনের অবস্তুগত যোগসূত্রগুলো (immaterial nexuses)-র মধ্যে। এই যোগসূত্রগুলো আবার বিকাশ লাভ করে যোগাযোগ শিল্পগুলোর দ্বারা। যোগাযোগ তন্তুজালগুলোর বিকাশের সাথে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভবের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। একটি তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত একক একটি বায়ো-পলিটিক্যাল বিশ্ব গড়ে উঠেছে। বিশ্ব অর্থনীতির উত্তরাধুনিকীকরণের মধ্যে, সম্পদ সৃষ্টির মধ্যে আরও বেশি করে বায়োপলিটিকাল উৎপাদনের, স্বয়ং সমাজ জীবনের উৎপাদনের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। যার মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকের সমাপতন (overlap) ঘটে এবং তারা একে অন্যকে ক্ষমতা-মন্ডিত করে (invest)। সমাজব্যবস্থার সকল রেজিস্টারে সাম্রাজ্যের শাসন কাজ করে, সমাজ জগতের একেবারে গভীর তলদেশ পর্যন্ত। সাম্রাজ্য শুধু একটি জনসমষ্টি ও ভূখন্ডের তত্ত্বাবধান করে না, সে যে জগতে বাস করে তাকেও সৃষ্টি করে। সে শুধু মানবীয় মিথষ্ক্রিয়া (interactions)-কে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং মানব প্রকৃতিকে সরাসরি শাসন করবার চেষ্টাও করে। তার শাসনের লক্ষ্যবস্তু হল সামগ্রিক সমাজ জীবন। এভাবেই সাম্রাজ্য বায়ো-পাওয়ারের প্যারাডাইমাটিক রূপকে উপস্থাপনা করে।

সাম্রাজ্যের মধ্যে বিকল্প কী এনিয়ে লেখকদ্বয় ভেবেছেন। বলছেন, আজকের দিনে প্রায় সমগ্র মানবজাতি পুঁজিবাদী শোষণের তন্তুজালের মধ্যে কিছুটা মাত্রায় নিমজ্জিত অথবা তার অধীনস্থ। ১৯৬০-এর দশকের পরে, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও উদারনৈতিক বামপন্থীদের সাম্প্রতিক সঙ্কটের যে দীর্ঘ দশকগুলো কাটছে সেসময়ে ত্রিটিকাল চিন্তার একটা বড় অংশ প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে চেয়েছে। ত্রিটিকাল চিন্তা মানে সমালোচনাত্মক বিচার-ধর্মী চিন্তা। ঐসব প্রতিরোধ-ক্ষেত্রগুলোর ভিত্তি হল সামাজিক বিষয়ী (subjects) বা জাতীয় বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত আত্ম-পরিচয় (identities)। প্রায়শই সংগ্রামগুলোর স্থানীয়করণ (localization)-এর ওপর রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে দাঁড় করানো হয়। এসব যুক্তি মাঝে মাঝে নির্মাণ করা হয় স্থান ভিত্তিক আন্দোলন বা রাজনীতির সাপেক্ষে। সেসব ক্ষেত্রে স্থানের সীমানা (আত্ম-পরিচয় বা ভূখন্ড হিসেবে বিবেচিত)-কে বিশ্বব্যাপী তন্তুজালিকার সমসত্ত্ব, সমধর্মী, অপৃথকীকৃত ভূমি (space)-র বিপরীতে তুলে ধরা হয়। এ ধরনের উত্তর আধুনিক প্রয়াসকে নেগ্রি ও হার্ট সমালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন এ ধরনের স্থানীয়করণমুখী অবস্থান ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর। ভ্রান্ত কারণ সমস্যাটিকে সঠিকভাবে ধরা হয়নি। অনেক বিশ্লেষণে সমস্যাটি দাঁড়িয়ে আছে গ্লোবাল আর লোকালের মিথ্যা বৈপরীত্য (dichotomy)-র ভিত্তির ওপরে। এরূপ দৃষ্টিকোণ সহজেই গিয়ে বর্তায় একধরনের আদিমবাদী তত্ত্বে (primordialism) যা সামাজিক সম্পর্ক ও আত্মপরিচয়কে অপরিবর্তনীয় করে দেখে, রোমান্টিসাইজ করে।

পুঁজির বিদ্ধে সংগ্রামে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকের স্বার্থ আর ভূমিকাই প্রধান, এই ধারণা আজ অকেজো হয়ে গেছে বলে নেগ্রি মনে করেছেন। তাহলে বিকল্প কী? নেগ্রি ও হার্টের মতে, সাম্রাজ্যের এলাকায় ঢুকে পড়াটাই ভাল। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দুদিক থেকেই। সমস্ত জটিলতাসহ তার সমসত্ত্বকরণকারী (homogenizing) ও অসমসত্ত্বকরণকারী (heterogenizing) প্রবাহগুলোর মুখোমুখি হওয়াই ভাল। বিশ্বজনতা (multitude)-র ক্ষমতার মধ্যে আমাদের, বিশ্লেষণকে প্রোথিত করতে হবে। 'বিশ্ব জনতা' এই নতুন সাম্রাজ্যের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছে। আবার সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রামের বিষয়ীও হল তারা। যে বিশ্বজনতা সাম্রাজ্যের মধ্যে রয়ে গেছে এবং আজ পুনর্গঠিত (reconfigured) হচ্ছে তার ইতিহাস সৃষ্টি করবার ক্ষমতাকে বিবেচনা করতে হবে। জনতার সৃজন-শীল শক্তি যা সাম্রাজ্যকে ধরে রাখে, তা একটি প্রতি-সাম্রাজ্য (counter-Empire)-কে স্বয়ং উদ্যোগে নির্মাণ করতেও সমর্থ। ঐ প্রতি-সাম্রাজ্য হল বিশ্বব্যাপী প্রবাহ ও বিনিময়ের এক বিকল্প রাজনৈতিক সংগঠন। এই নতুন সাম্রাজ্যে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ মৃত। ঠিক যেমন সাম্রাজ্যবাদও আর নেই। বিশ্বজনতার সংগ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে নেগ্রি ও হার্ট বলছেন, বিশ্বে দেখা যাচ্ছে প্রভাবশালী ঘটনারাজি। সেগুলো প্রকাশ করছে ঐ জনতার শোষণ-প্রত্যাখানের চিহ্নকে। সেগুলো একটা নতুন ধরনের সর্বহারা সংহতি ও জঙ্গীপনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপর লেখকদ্বয় এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা ও আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন। যথা— তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনা (১৯৮৯), ইসরায়েলের বিদ্ধে প্যালেসতাইনের ইনতিফাদা, লস এন্জেলিসে অল্পতকায় মানুষদের বিদ্রোহ (মে ১৯৯২), ফ্রান্সে শ্রমিক ধর্মঘট (ডিসেম্বর, ১৯৯৫), দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমিক ধর্মঘট (১৯৯৬)।

যেহেতু এই সংগ্রামগুলোর মধ্যে সংযোগ নেই তাই নেগ্রি ও হার্ট এদের বায়োপলিটিক্যাল সংগ্রাম বলছেন। বলছেন, এক অভিন্ন সাধারণ শত্রুর স্বীকৃতি এখানে নেই। তাহলেও প্রতিটি সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের গঠনতন্ত্রকে তার সাধারণরূপে (in its generality) আক্রমণ করে। সব পরিস্থিতিগুলোকেই দেখে মনে হয় সুস্পষ্টরূপে বিশেষধর্মী (particular), অর্থাৎ সাধারণ বা সামান্যধর্মী (general) নয়। কিন্তু বস্তুত তারা সকলেই সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে প্রত্যক্ষভাবে। চায় একটা প্রকৃত বিকল্প।

তাই নেগ্রি ও হার্টের মতে আজকের রাজনৈতিক কর্তব্য হল অভিন্ন সাধারণ শত্রুর স্বরূপ উন্মোচন এবং এমন একটা নতুন অভিন্ন সাধারণ ভাষা নির্মাণ যা সংযোগ সাধনে (communication) সাহায্য করবে। সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক নির্মাণের ইতিবাচক এলাকা হল জনতার আন্দোলন। সাম্রাজ্যের বিদ্ধে জনতাকে সংগঠিত করার কাজকে পূর্ণ করবে এমন একটা ইস্তেহার দরকার।

এমপায়ার গ্রন্থে লেখকরা দেখাচ্ছেন কীভাবে সার্বভৌমত্ব সাম্রাজ্যে পরিণত হল। স্ববিরোধিতাপূর্ণ ইওরোপীয় আধুনিকতা থেকে এল ঔপনিবেশিক সার্বভৌমত্ব। তার থেকে মার্কিন সার্বভৌমত্বের ক্ষমতার তন্তুজাল। তার থেকে সাম্রাজ্য। নেশান বা জাতি হল একটা আত্মিক (spiritual) নির্মাণ। ইওরোপীয় আধুনিকতার স্ববিরোধিতাগুলোর থেকে তার উদ্ভব। সব জাতীয়তাবাদই প্রতিক্রিয়াশীল। এমনকি ফরাসি বিপ্লবের প্রথমদিকে জাতির যে ধারণা তাও। লেখকদ্বয় বলছেন, নিজেকে বিপ্লবী বলে যখন দেখাল তখনই জাতির এই ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। নিপীড়িত জাতিগুলোর জাতীয়তাবাদও প্রতিক্রিয়াশীল। দেখে মনে হয় জাতির ধারণা প্রভুত্বকারীর হাতে পুনর্জ্জীবন ও নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধিতে যেমন সাহায্য করে, তেমনই এটি অবদমিতের হাতে বিপ্লব ও পরিবর্তনের একটি হাতিয়ারও বটে। কিন্তু এই মনে হওয়াটা ঠিক নয়। নেগ্রি ও হার্টের মতে, কাঠামোটির উল্টো পিঠ বিদেশি শক্তিকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু সেটা নিজেই একটা প্রভুত্বকারী শক্তি। সেটা একটা সমপরিমাণ ও বিপরীত অভ্যন্তরীণ নিপীড়ন চালায়। অভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলোকে দমন করে। বিরোধী পক্ষকেও। আর এসবই সে করে জাতীয় সত্ত্বা বা আত্ম-পরিচয়, ঐক্য ও নিরাপত্তার নাম করে। কৃষ্ণকায়দের জাতীয়তাবাদ (black nationalism)-এর ক্ষেত্রেও, প্রগতিশীল উপাদানগুলোর সাথে অনিবার্যভাবে যুক্ত থাকে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ছায়া। যখন কৃষ্ণ জাতীয়তাবাদ আফ্রিকান আমেরিকান জনসাধারণের সমসত্ত্বধর্মিতা ও একরূপতা (uniformity)-কে তার ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরে তখন সে শ্রেণী পার্থক্যকে আড়াল করে। আবার যখন সে সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ খন্ডাংশ (segment)-কে সমগ্রের কার্যত প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করে, যেমন আফ্রিকান আমেরিকান পুষকে, তখন নিম্নবর্গীয় জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীল কার্যাবলীর গভীরে দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতা চিরকালের জন্যে

সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

লেখকদ্বয় স্বয়ং রাষ্ট্রের বিদ্ধে একটি নৈরাজ্যবাদী বিরোধিতার মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, জাতি ধারণার এইসব দ্ব্যর্থব্যঞ্জক প্রগতিশীল কার্যাবলী প্রাথমিকভাবে উপস্থিত থাকে যখন জাতি সার্বভৌমত্বের সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত নয় তখন। অর্থাৎ যখন কল্পনা প্রসূত জাতি (imagined nation)-র তখনও পর্যন্ত বাস্তব অস্তিত্ব নেই। জাতীয় মুক্তি এবং জাতি রাষ্ট্র নির্মাণের সাথে সাথে, আধুনিক সার্বভৌমত্বের সমস্ত নিপীড়নমূলক কাজকর্ম অনিবার্যভাবে পূর্ণ শক্তিতে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ লেখকদ্বয় সবধরনের জাতীয়তাবাদেরই বিরোধী। তাঁরা বলেন, সাম্রাজ্যের বিদ্ধে আজকের লড়াইয়ে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থ আর জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে এ নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। জাতীয় রাষ্ট্রের আইন দিয়ে বিশ্বায়নকে ঠেকানো যাবে না। তার জন্যে চাই উপযুক্ত নতুন বিপ্লবী রণনীতি।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের মতো এই সাম্রাজ্য। নেগ্রিরা বলছেন এই সাম্রাজ্যের ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে টিকে থেকেছে ও পরিপক্কতা লাভ করেছে। বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী স্তরে পূর্ণ বাস্তবায়িত রূপে উদ্ভূত হয়েছে।

ক্ষমতার তন্তুজাল (Network Power), মার্কিন সার্বভৌমত্ব ও নতুন সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে নেগ্রি ও হার্ট আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের ধারণার আদি বিকাশ প্রক্রিয়াকে দেখলে আমরা আধুনিক সার্বভৌমত্বের সাথে তার তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যকে বুঝতে পারি। নতুন সাম্রাজ্যগত (imperial) সার্বভৌমত্ব গঠিত হয়েছে কোন্ কোন্ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেটা বুঝি। মার্কিন অভিজ্ঞতা আমাদের দেখায় যে ক্ষমতা গঠিত হতে পারে এক সমগ্র সারিবদ্ধ ক্ষমতা গুচ্ছের দ্বারা যারা নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেরাই নিজেদের বিভিন্ন তন্তুজালে বিন্যস্ত করে, সাজিয়ে রাখে। সার্বভৌমত্বকে প্রয়োগ করা চলে বিবিধ কাজকর্মের একটা বিশাল দিগন্তরেখার মধ্যে। ঐ কাজকর্মগুলো সার্বভৌমত্বকে খন্ডখন্ড করে বিভাজিত করে। অথচ তার ঐক্যকে নাকচ করে না। ঐ কাজকর্মগুলো জনতার সৃজনশীল আন্দোলনের প্রতি ঐ সার্বভৌমত্বকে বারংবার, অবিরাম অধীনস্ত করে রাখে। মার্কিন সংবিধান তৈরি হয়েছিল দুর্নীতির মধ্যে চক্রাকার পতনকে ঠেকাতে। সমগ্র জনতাকে সে উদ্দেশ্যে সক্রিয় করে তুলে। তার গঠনকারী সামর্থকে সংগঠিত বিপরীতশক্তির তন্তুজালে সংগঠিত করে। বৈচিত্রময় ও সাম্যযুক্ত কাজকর্মের প্রবাহে এনে। গতিশীল ও প্রসারধর্মী আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াতে যুক্ত করে। লেখকদ্বয় অবশ্য স্বীকার করেন যে আমেরিকার প্রসারধর্মী সাম্রাজ্যগত গতিশীলতা (imperial movement)-য় কিছু বিচ্যুতি আছে। যথা, নেটিভ আমেরিকানদের এই প্রসারধর্মী গতিশীলতায় টেনে আনা যায় নি। বরং তাদের খতম করে নির্মূল করতে হয়েছে। আফ্রিকান আমেরিকানদের ক্রীতদাস করা হয়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা ইওরোপিয়ান ছাঁদের সাম্রাজ্যবাদের পথ নিয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালিয়েছে। একসময়ে মনরো নীতি অনুসরণ করেছে। নেগ্রিদের মতে, তবে এরকম বিচ্যুতির পরে, আমেরিকা তার সাম্রাজ্যগত কর্মসূচিকে পুনজ্জীবিত করেছে। অর্থাৎ তন্তুজালিক ক্ষমতা (Network Power)-এর বিশ্বব্যাপী কর্মসূচিকে পুনজ্জীবিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধের ইতিহাস শেষ হয়েছে। অবশ্য নেগ্রি ও হার্ট স্বীকার করেছেন যে সাম্রাজ্যের মধ্যে জাতিগত বৈষম্যবাদ (Racism) চলে এসেছে। তাঁরা বলছেন অনেক পণ্ডিত এই চলে আসাকে রেসিজ্‌মের প্রাধান্যকারি তাত্ত্বিক রূপের মধ্যে একটা পরিবর্তন বলে বর্ণনা করেছেন। জীবতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত রেসিজ্‌ম থেকে সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত রেসিজ্‌মের তত্ত্ব। সাম্রাজ্যের দিকে রূপান্তরের সাথে সাথে জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যগুলোর স্থান নিয়েছে সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ক (signifier) গুলো। জাতিগত বৈষম্যবাদী ঘৃণা ও ভীতির মূল উপস্থাপন (Key Representation) বদলে গেছে তবে সাম্রাজ্য হল সকলেরই অন্তর্ভূক্তি-কারি (all-inclusive)। সকলকেই তার সীমান্তের মধ্যে সে স্বাগত জানায়, জাতি-কুল (race), বিশ্বাস, বর্ণ, লিঙ্গভেদ, যৌন-অভিমুখ ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

লেখকদ্বয় বলছেন আজকের দিনে রিপাবলিকান হওয়ার অর্থ হল সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের মধ্যে সংগ্রাম করা এবং সাম্রাজ্যের বিদ্ধে নির্মাণ করা। সব ধরনের নীতিবাদ (moralism) এবং অসন্তুষ্টি ও নষ্টালজিয়ার সমস্ত অবস্থানের বিদ্ধে আমরা বলব যে মুক্তি ও সৃষ্টির জন্যে এই নতুন সাম্রাজ্যগত (imperial) রণনৈতিক ভূখন্ড (terrain) বৃহত্তর সম্ভাবনা বহন করছে। এই যে জনতা, তার বিদ্ধে-যাওয়ার-ইচ্ছে এবং তার মুক্তিলাভের আকাংক্ষায়, সে সাম্রাজ্যকে অন্যরূপে প্রকাশিত হতে বাধ্য করবে। নেগ্রি ও হার্ট সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। তাঁদের মতে সাম্রাজ্যের গঠনের তত্ত্ব একই সাথে তার পতনের তত্ত্ব। সাম্রাজ্য সংজ্ঞায়িত হয় সংকটের দ্বারা। তার অবনমন শু হয়ে গেছে। তাঁরা জনতার মধ্যে বিকল্প খুঁজেছেন। তাঁদের মতে পদানত উৎপাদক এবং শোষিতদের জনতারূপে গঠিত হওয়াকে ২০ শতকের বিপ্লবগুলির ইতিহাসে আরও স্পষ্টভাবে পাঠ করা যায়। ১৯১৭ এবং ১৯৪৯ সালের কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের মাঝে, ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকের মহান ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামগুলির মধ্যে এবং ১৯৬০ এর দশক থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত অসংখ্য মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে, জনতার নাগরিকত্বের শর্তগুলি জন্মেছিল, ছড়িয়ে গিয়েছিল, সংহত হয়ে ছিল। পরাজিত হওয়াতো দূরের কথা, বিশ শতকের বিপ্লবগুলির প্রত্যেকটিই শ্রেণী বিরোধের ছককে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেছে ও রূপান্তরিত করেছে। একটা নতুন রাজনৈতিক বিষয়ীতা (subjectivity)-এর শর্তগুলিকে সম্ভব করেছে। এ হল সাম্রাজ্যগত ক্ষমতার বিদ্ধে এক বিদ্রোহী জনতা। এভাবেই লেখকদ্বয় সাম্রাজ্যের বিকল্প হিসেবে তাদের জনতাতত্ত্ব-এর সমর্থনে বিশ শতকের বিপ্লবগুলোকে উল্লেখ করেছেন। এই জনতার প্রথম রাজনৈতিক দাবি হল বিশ্বব্যাপী নাগরিকত্ব (global citizenship) অর্থাৎ এক সীমান্তবিহীন বিশ্ব। নেগ্রির মতে সারা বিশ্বজুড়ে শোষিত মানুষের দাবি করা উচিত, শুধু বিশ্বজনীন মানবাধিকার নয়, বিশ্বজনীন নাগরিকত্ব। পুঁজি যদি গ্লোবাল হয়, সার্বভৌমত্ব যদি গ্লোবাল হতে চায়, তাহলে শ্রমিক কেন চাইবে না যে পৃথিবীর যে কোনো দেশে সে কাজ খুঁজতে পারবে, বাস করতে পারবে, সব জায়গায় তার নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হবে? নেগ্রির মতে, এমন দাবিই ছুঁড়ে দেবে গ্লোবাল পুঁজি আর সাম্রাজ্যের সামনে প্রকৃত বিপ্লবী চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় দাবি, সকলের জন্যে নিশ্চয়তাযুক্ত আয় ও একটি সামাজিক মজুরি (social wage)।

নেগ্রি ও হার্টের 'সাম্রাজ্য' ধারণা সম্পর্কে বামপন্থী বিশেষত মার্কসবাদী মহল থেকে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে যার অনেকটাই মূল্যবান ও গুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। জাতি-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব যে সঙ্কটের মুখে পড়েছে নেগ্রি ও হার্ট বোধ হয় সে বিষয়টিকে একটু বাড়িয়ে দেখছেন। অতি-জাতীয় সংস্থাগুলো (supra-national bodies)-র উদ্ভবের ফলে জাতি-রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কিন্তু পুরোপুরি মোটেই ক্ষয়ে যায় নি। বরং ঐ অতি-জাতীয় সংস্থাগুলো গঠিত হয় জাতি-রাষ্ট্র নিয়ে, রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার চুক্তির মাধ্যমে। ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে ধনী উন্নত রাষ্ট্রের পদানত করে রাখতে, ধনী রাষ্ট্রে পুঁজিবাদের স্বার্থে, এইসব অতি-জাতীয় সংস্থার মঞ্চ ব্যবহৃত হয়। চূড়ান্ত বিচারে, WTO, IMF, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি অতি-জাতীয় সংস্থা ধনতন্ত্রের বিদ্ধে যেতে অক্ষম। তাই IMF-এর স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টের শর্ত বা বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ শর্তের কথা প্রায়ই শোনা যায়। বি. শিবরামনের সঙ্গত প্রশ্ন—আধিপত্যকারী শক্তি (hegemon)-র নাগালের মধ্যে বিশ্ব এসে গেছে মানে ক্ষমতার কোনো ভূখন্ডগত কেন্দ্র আর নেই? তাহলে আমেরিকার ন্যাশনাল মিসাইল ডিফেন্স ও থিয়েটার মিসাইল ডিফেন্স কেন? সীমান্তের গুত্ব না থাকলে প্রথম গাল্‌ফ ওয়ার হল কেন? এটা হয়েছিল কারণ ইরাক কুয়েতের সীমান্ত লঙ্ঘন করেছিল। ঐ অঞ্চলের শক্তি-সাম্যে ও তার পরিণামে বিশ্বের তেল সরবরাহে বিপদের ঝুঁকি এনেছিল। এমনকি আজকের 'সন্ত্রাসবাদের বিদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ'-

কেও একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডেই প্রথম কেন্দ্রীভূত করতে হল, যথা—আফগানিস্থান। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রকে বোমা মেরে বিধবস্ত করে দেওয়া হল। তাছাড়া, শুধু NAFTA-র জন্যে আমেরিকা ও মেক্সিকোর আত্ম-পরিচিতিকে সঙ্কর (hybrid) বলা যাবে? আমেরিকা আর ইরাক কি একটা নমনীয় হায়ারার্কিতে যুক্ত? এমনকি দুই অর্থনৈতিক মিত্র চীন-আমেরিকাও তা নয়। আমেরিকা ও কিউবার মধ্যে বহুত্ববাদী বিনিময় সম্ভব?

জাতি-রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের বিদ্ধে নেগ্রি ও হার্টের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় কোনো জাতির ইচ্ছার বিদ্ধে অন্য জাতির প্রভুত্ব ও অর্থনৈতিক শোষণকে সমর্থন করা যায় না। আমরা পোস্ট-কলোনির মানুষ, আমাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে সার্বভৌমত্ব, জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের একটা আলাদা আবেদন আছে। ইওরোপীয়রা যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল, তখন পরাজিত দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আদৌ চিন্তিত ছিল না। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, আমাদের সার্বভৌমত্বকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি বলেই আমাদের এত দুর্দশা, অপমান। তাই এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকার সব কটি উপনিবেশেই জাতীয় আন্দোলনের সব কটি ধারার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা। আগে যা ছিল কেবল ইওরোপের দেশগুলোর বিশেষ অধিকার, তা স্বীকৃত হল বিশ্বের প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার হিসেবে। আমাদের সার্বভৌমত্ব বহু কষ্টে অর্জিত এবং সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে সংগ্রামে ঐ সার্বভৌমত্বের গুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ও আছে। আমরা তা এত সহজে ছাড়তে পারি না। আইরিশ প্রশ্নে মার্কস দেখান প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের পার্থক্য। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধী লেনিন কিন্তু একইসাথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে গুত্ব দেন। জাতিগুলোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করেন।

আজকে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে যেখানে বিশ্ব জুড়ে—ইওরোপে, আমেরিকায়, তৃতীয় বিশ্বে—যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন চলেছে, সেখানে নেগ্রিদের বক্তব্য যে সাম্রাজ্যবাদী কোনো প্রকল্পের কেন্দ্র হিসেবে আর কোনো জাতি রাষ্ট্র থাকা সম্ভব নয় এ কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। তাঁরা গ্রন্থটি লিখেছিলেন সেপ্টেম্বর ১১ ঘটনার আগে। অথচ ঐ ঘটনা সন্ত্রাসবাদের বিদ্ধে যুদ্ধের নাম করে এক বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের প্রকল্পে আমেরিকার নেতৃত্বদায়ী ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠা করল। বহুমে-বিশিষ্ট হবার প্রবণতা বিশ্বে থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্বকারী (dominant) আধিপত্যকারী (hegemonic) একক অতিবৃহৎশক্তির ভূমিকা বিশ্বকে একমেপ্রবণ করার চেষ্টায় নিয়োজিত। নেগ্রিদের কথা থেকে মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিশ্বনীন করে তুলেছে। তার নেতৃত্বে ঘটছে বিশ্বায়ন যার পরিণতি এক চিরায়ত সাম্রাজ্য। তাই ইতিহাসের সমাপ্তি। আমরা বলব, কোনো সাম্রাজ্যবাদী জাতি-রাষ্ট্র মোটেই স্থান-কাল-ইতিহাসের উর্দ্ধে নয়। লেনিন যেখানে বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধ, নেগ্রিরা সেখানে মনে করেন, 'সাম্রাজ্য' মানেই শান্তি। আজ প্রথম ইরাক যুদ্ধ, বসনিয়ার যুদ্ধ, আফগানিস্থান আক্রমণ, দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধ ইত্যাদির পরেও নেগ্রিদের বিশ্লেষণ যথার্থ মনে করা কঠিন।

নেগ্রিরা নতুন 'সাম্রাজ্য'কে গণতান্ত্রিক মনে করেছেন। এখানেই সাম্রাজ্যের একটি বড় দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যের আদর্শ হল গণতন্ত্র। অথচ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের কার্যকর কোনো রূপরেখা সে উপস্থিত করতে পারে নি। তাই বাস্তব ক্ষমতার কথা ভেবে অনেকেই তাকে খাতির করে বটে, কিন্তু তার আধিপত্যের নৈতিক ভিত্তি বলে প্রায় কিছু নেই। বিশ্বায়নের ফলে বহু দেশে বহু স্তরের মানুষ যে তাদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে পুঁজি আর সাম্রাজ্যের সদর দপ্তরে যার ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যার কর্তাদের ভোটে দাঁড়াতে হয় না। মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। আর সব সাম্রাজ্যের মতো এরও পতন অনিবার্য। এর সঙ্কট গড়ে উঠবে শোষণ, দারিদ্র ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে ঘিরে। বিশ্বের নানা প্রান্তে গণতন্ত্রকে আরো ব্যাপক, আরো গভীর করার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, শোষণ ও দারিদ্রের বিদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই নেগ্রিরা যে দাবিদু'টো তুলেছেন সেগুলো মিটতে পারে। বিনাগরিকত্ব এবং সামাজিক মজুরি ও সকলের আয়ের নিশ্চয়তা। পুঁজিবাদের মধ্যেই প্রকৃত আয় বাড়তে পারে। তাহলে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিদ্ধে লড়াইয়ের কর্মসূচি কোথায়? তাছাড়া সারা পৃথিবী জুড়ে শোষিত জনতা অসংগঠিত আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হঠাৎ একদিন বিশ্বপুঁজির বুনিয়াদ ধ্বংস করে দেবে, নেগ্রির এই স্বপ্ন অবাস্তব বলে মনে হয়। বরং আমরা তাকাই বিশ্ব জুড়ে বিশ্বায়ন-বিরোধী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের দিকে। সাম্রাজ্য যতই একচ্ছত্র সার্বভৌম চেহারা নিতে চাইছে, ততই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিবাদ হচ্ছে। পশ্চিমী রাষ্ট্রনেতা, MNC-র কর্ণধার, IMF কি WTO বা বিশ্বব্যাঙ্কের কর্তারা আজ নিজেদের মধ্যে কোথাও একটা সভা করতে গেলেই কয়েকহাজার আন্দোলনকারী জড়ো হয়ে যায়। এ ঘটনা খোদ পশ্চিম ইওরোপে, উত্তর আমেরিকায় ঘটছে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জেনোয়ার বিক্ষোভ, ইরাক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন এর বড় উদাহরণ।

এটা ঠিক যে নেগ্রি-বর্ণিত নিয়ন্ত্রণের অনেক রকম নিদর্শন চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে। আর্থিক-বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বনীন নিয়ন্ত্রণ আছে। বাণিজ্যিক আইনের ক্ষেত্রে নানা স্তরে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক আইন রচনা আর তা প্রয়োগ করার জন্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরির কাজ এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি মানবাধিকার লঙঘনের অপরাধে শাস্তি দেবার মতো অতি রাজনৈতিক বিষয়েও আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা চলেছে। যথা—মিলোসেভিচের বিচার। বেলজিয়ামে আইন পাশ হয়েছে, যে কোনো দেশে যে কোনো দেশের নাগরিকের ওপর অমানবিক অত্যাচার ঘটলে অপরাধীকে বেলজিয়ামের আদালতে হাজির করে বিচার করা যাবে। য়ান্ডাতে গণহত্যায় জড়িত থাকার অপরাধে এই আইনে সম্প্রতি চারজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিশ্বনীন মানবাধিকার রক্ষা যদি সাম্রাজ্যের আদর্শ কাজ হয়, সে কাজ শুধু আন্তর্জাতিক বিচারালয় থেকে হচ্ছে না। দৈনন্দিন সে কাজ করছে অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল, মেদিস্যাঁ সঁ ফ্রন্তিয়ের, অক্সফ্যাম ইত্যাদি অসংখ্য আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এন. জি. ও.। বিশ্বনীন সাম্রাজ্যের আদর্শগত ভিত্তি সেখানেই রোজ তৈরি হচ্ছে।

নেগ্রিরা যে সাম্রাজ্যবাদ সমাপ্ত বলছেন, সামির আমিনের আপত্তি এখানে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়েছে সাম্রাজ্যে একথা মানা যায় না। সাম্রাজ্যবাদ আজও প্রবলরূপে বিদ্যমান এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বিশ্বনেতা হবার প্রবণতা একমাত্র অতিবৃহৎ শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। সে যুদ্ধও করবে, অন্য দেশকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দখলও করবে। সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র সার্বভৌম জাতীয়-রাষ্ট্র যেমন আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স। বিশ্বনীন শান্তির প্রতি নেই তাদের দায়বদ্ধতা। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীও অনেক। তবে একই সাথে আমরা বলতে পারি, সাম্রাজ্যবাদের পুরনো হিংস্র যুদ্ধবাজ রূপের পাশাপাশি বিশ্বে 'সাম্রাজ্য' প্রক্রিয়াটিও শু হয়েছে। সেখানে রাজ্য দখল, যুদ্ধ অপ্রয়োজনীয়। একটা বিশ্বজোড়া, নমনীয়, আইনের শাসন-ভিত্তিক, প্রতিষ্ঠান-নির্ভর, স্বয়ং-শাসিত, শান্তি-সন্ধানী, শত্রুহীন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া আধুনিক ক্ষমতা-তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। ফুকোর ডিসিপ্লিনারি রেজিম ও গভর্নমেন্টালিটির ধারণা দিয়ে এই 'সাম্রাজ্য'-কে বোঝা যায়। বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা-প্রক্রিয়ার এই রূপটিতে বিশ্ববাসীর মনন-নিয়ন্ত্রিত হবে ক্ষমতাতন্ত্রের দ্বারা। তাই সাম্রাজ্যের শাসিত তার স্ব-ইচ্ছায় মেনে নেবে ক্ষমতাকে। অবশ্য এই স্ব-ইচ্ছাটি নির্মিত হবে ক্ষমতাতন্ত্রেরই দ্বারা। এই ক্ষমতাতন্ত্র কেন্দ্র-বিহীন, সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে তাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা বৃথা। এই সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য এ দুটিকে দ্বিত্বানুসারী বিপরীত (Binary) না ভেবে পরস্পর অতিনির্ণীত বলে ভাবাই ভাল।

৫. আলোক-প্রাপ্তির ক্ষমতা-এষণা

ইরাক যুদ্ধকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতাকে মার্কসবাদীরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার অনেকটাই অর্থপূর্ণ বলে মনে করি। এটা সত্যি যে মার্কসবাদী

বিশ্লেষণে অর্থনীতি ও শ্রেণী মাত্রাতিরিক্ত গুত্ব পায়। কিছুটা পরিমাণে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁক থাকে। ক্ষমতাকে শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে দেখার প্রবণতা থাকে। থাকে বিভিন্ন ধরনের এসেন্সিয়ালিজম বা নির্যাসকরণ। তবু এটা মানতেই হবে যে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ আজকের ইরাক যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার প্রকৃতিকে বাস্তব তথ্য, গবেষণা, সংখ্যাতত্ত্ব, উপাত্ত, অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান, রাজনৈতিক চেতনা, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্র আজ যে দানবীয় রূপ নিয়েছে তার অনেকটারই যথার্থ উপস্থাপনা ঘটেছে মার্কসবাদী ব্যাখ্যায়। যদিও মার্কসবাদেরও বিভিন্ন ধারা আছে। তাহলেও মোটামুটিভাবে সব ধরনের মার্কসবাদই আজ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতার স্বরূপ উন্মোচনে ও মূল্যায়নে ভূমিকা নিয়েছে। আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রূপটি সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। এই একমেপ্রবণ বিশ্বে একমাত্র অতি বৃহৎ শক্তি, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নায়ক, এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে প্রধান ও মূল শত্রু হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। তা যথার্থ। কোনো উত্তর আধুনিক তত্ত্বই এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে এ কাজ করে নি। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এই ভয়াবহ আগ্রাসন হয়তো অনেকটাই আমাদের, ফেনোমেনোলজিকাল অর্থে, উপলব্ধি হয়েছে, এমনকি প্রাক-যুক্তিবোধ, প্রাক্-চিন্তন স্তরে নিতান্ত প্রাথমিক, আদিম বোধের (primordial) স্তরে আমাদের চৈতন্যে তার উপস্থিতি ধরা পড়েছে। হয়তো অনেকটা একজিসটেনশিয়াল অর্থে, আমাদের যাপিত জীবনের অন্তর্লীন, অন্তর্জাত বোধের স্তরে তার অস্তিত্ব। ইরাকের লক্ষ লক্ষ মৃত, পঙ্গু, অনাথ শিশু, জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, ধ্বংসস্তূপ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শরীর, আর বিশ্ব জুড়ে হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদ-মিছিল সে বোধকে সম্ভব করে তুলেছে। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের একদা নকশালপন্থী মার্কসবাদী যৌবন সে বোধকে গাঢ় করেছে।

কিন্তু একই সাথে আমার মনে হয় মার্কসবাদী বিশ্লেষণকে অন্তত কিছু উত্তর আধুনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। একবার মার্কসবাদী হলেই বা কি জীবন অন্ধ হয়ে বাঁচতে হবে একথা মার্কস কখনো ভাবেন নি। নতুন কোনো তত্ত্ব দেখলেই ভয়ে চোখ বুজে ফেলতে হবে, পাছে এড্স কি সার্সের মত পোস্টমডার্ন জীবানু শরীরে কি মননে ঢুকে পড়ে, এমন ভীতা দুঃসাহসী মার্কসকেই অপমান করে। এটা ঠিক উত্তর আধুনিক অনেক ভাবনা মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদ, ইরাক যুদ্ধ ও ক্ষমতা প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে দিতে পারে। সে বিপদ আছে মানছি। কিন্তু বিপদের ভয়ে জটিলতর কঠিনতর কর্তব্যের মুখোমুখি হতে মার্কসবাদীরা ভয় পায় নাকি? উত্তর আধুনিক বিশ্লেষণের বিশাল ভান্ডার থেকে প্রাসঙ্গিক অস্ত্র, তাত্ত্বিক হাতিয়ার, ধারণা ও ব্যাখ্যাকে তুলে আনতে হবে। কঠোর পর্যালোচনা, তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণ ও দুঃসাধ্য মূল্যায়নের মাধ্যমে। এভাবেই মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আলোচনা নিজেকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে সক্ষম। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব যেমন বিশেষ কার্যকর, তেমনি জ্ঞানতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, ক্ষমতা-সংশ্লিষ্ট, সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে ফুকো, দেরিদা, লিওতারদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যথেষ্ট সহায়ক। উত্তর আধুনিক তত্ত্বের সাথে মার্কসবাদের কথোপকথনের প্রস্তাবে যেসব গোঁড়া, অন্ধ ও যান্ত্রিক মার্কসবাদী রীতিমতো আঁতকে ওঠেন, তাঁরা আসলে একটা কঠিন ও জটিল অথচ সামাজিকভাবে একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্যকে এড়িয়ে যান।

ইরাকের যুদ্ধের পেছনে সাম্রাজ্যবাদ যেমন একটা বড় কারণ, তেমনি এন্লাইটেন্মেন্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতার এষণা (will to power)-ও আরেকটি বড় কারণ। সাম্রাজ্যবাদ, প্রধানত তার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চরিত্র, শ্রেণী-সম্পর্ক, বিশ্ব পুঁজিবাদ, বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদী সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র এসব সংক্রান্ত গভীর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আমরা মার্কসবাদী তত্ত্বে পেয়েছি। আবার ১৮ শতকের ইওরোপীয় আলোকপ্রাপ্তি (এন্লাইটেন্মেন্ট), পাশ্চাত্য আধুনিকতা, যুক্তিবাদ, যন্ত্র-সভ্যতা এসব নিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা পাই উত্তর আধুনিক তত্ত্বে। ইরাকের যুদ্ধ শুধু সাম্রাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক স্বার্থ, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুনাফা, মার্কিন বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থের ব্যাপার মাত্র নয়। সেসব আছে। খুব গুত্বপূর্ণও বটে। তবে সেসবের সাথে আরও বৃহত্তর গভীরতর কোনো ক্ষমতা এষণার যোগ আছে। তা সর্বদা ও সর্বত্র অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা চালিত নাও হতে পারে। ক্ষমতা নিজেই নিজের অস্তিত্বের কারণ ও যৌক্তিকতা হতে পারে। এখানে আমরা ক্ষমতাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে অর্থনীতি ও শ্রেণীগত কারণ থেকে সৃষ্ট ক্ষেত্র বলে মনে করছি না। অর্থাৎ এখানে আমরা মার্কসবাদী বিশ্লেষণ থেকে কিছুটা সরে আসছি। বরং উত্তর আধুনিক দার্শনিক মিশেল ফুকোর ক্ষমতার তত্ত্ব আমাদের এক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এন্লাইটেন্মেন্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) কর্মকান্ডের রাজনৈতিক প্রয়াস হল নিজেকে বিশ্বজনীন অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র অধিকারী বলে প্রতিষ্ঠা করা। আলোকপ্রাপ্তির মেটান্যারেটিভ/ গ্র্যান্ড্যারেটিভের ব্যাপকতর রাজনৈতিক প্রজেক্ট এটি। পাশ্চাত্যের এনলাইটেন্মেন্ট মডার্নিটির চোখে পৃথিবীর অন্য সব জ্ঞানতত্ত্ব, ধ্যান-ধারণা, তত্ত্ব, যুক্তিধারা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধ অযুক্তি দ্বারা চালিত। তার নিজের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ হল সত্যকে লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। পাশ্চাত্য আধুনিকতা চায় অন্য সব বিচারধারা, জীবন-বোধ, সমাজ-প্রক্রিয়া ও চিন্তার ঐতিহ্যকে গ্রাস করতে। থাকবে না কোনো বহুত্ব, ভিন্নতা। সারা দুনিয়াটাকে পশ্চিমী আধুনিক সভ্যতার একরূপী ছাঁচে গড়ে নিতে চায় এন্লাইটেন্মেন্ট। কারণ তার বিশ্বাস সেই একমাত্র যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান সম্মত, নিঃসংশয়, বিশ্বজনীন চরম সত্যের মালিক। ফুকো, দেরিদা, লিওতার প্রমুখের লেখায় বারে বারে এই বিশ্বজনীন সত্যের একমাত্র মালিক হবার উদ্ধত দাবি সমালোচিত হয়েছে। এক সর্বগ্রাসী, দাম্ভিক যৌক্তিকীকরণ (rationalization) গ্রোথিত আছে এনলাইটেন্মেন্টের মজ্জায় মজ্জায় যাপনে মননে।

এনলাইটেনমেন্টের মধ্যে আছে ক্ষমতার এষণা, অপরকে পদানত ও অবদমিত রাখার আকাঙ্ক্ষা। আছে তার ঔপকরনিক যুক্তি (instrumental reason)-এর প্রভুত্ব, বৈজ্ঞানিক পজিটিভিস্ট জ্ঞানের চরম ও একক যথার্থতা, শিল্পায়ন ও ভোগবাদী যন্ত্র-সভ্যতা, জাতি-রাষ্ট্রের হোমোজেনাইজেশান প্রক্রিয়া। আছে অপর যথা কলোনির জাতি-সমাজ-যুক্তি-বিশ্বাস-সম্প্রদায়-জ্ঞানের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা। এই আধুনিকতা সর্বগ্রাসী। এই এনলাইটেনমেন্ট মডার্নিটিকে তার ভেতর থেকে ক্রিটিক (সমালোচনাত্মক বিচার) করে ও তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায় উত্তর আধুনিকতাবাদ (Critique of Enlightenment Modernity from within and beyond)।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকতাবাদী ডিসকোর্সের চোখে অন্য সব সভ্যতার মূল্য যে কত কম তা ইরাকের প্রাচীন স্মারক লুঠের মধ্যে দিয়ে আরো বেশি প্রমাণিত হল। যুদ্ধের আগে থেকেই সারা বিশ্বের পুরাতত্ত্ববিদ প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাচীন ইতিহাসবিদরা মার্কিন সরকারকে ইরাকের প্রাচীন সভ্যতার চিহ্নগুলোকে সযত্নে রক্ষা করতে বলেছিলেন। তাঁদের সাবধানবাণী সত্ত্বেও মার্কিন সরকার তাতে বিন্দুমাত্র কান দেন নি। মানব সভ্যতার সুপ্রাচীন কেন্দ্র বাগদাদ বাঙ্কার বাস্টার, ক্লাস্টার, স্মার্ট বোমা, টোমাহক, প্যাট্রিয়ট, ক্রুইজ মিসাইলে ক্ষত-বিক্ষত। ঐতিহাসিক টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর দুই তীরের সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা, বাবিলন ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার স্থাপত্য ও স্মারক চিহ্নগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে লুঠেররা। এখন জানা গেছে একাজ খুব সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। মার্কিন সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে ইরাকিদের এই প্রাচীন সভ্যতা, অতীত গৌরব ও যৌথ স্মৃতির আধার চিহ্নগুলোর দাম কানাকড়িও নয়। তাই তারা ইরাকিদের মধ্যে লুটপাটের সামাজিক নৈরাজ্যকে উসকে দিয়েছে। ইরাকিদের দিয়ে ইরাকের স্মারক লুট করিয়েছে। শিল্পোন্নত, উদ্ধত, আধুনিক পশ্চিমি সভ্যতার বাহক বলদর্পী মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী নীরব দর্শক হয়ে থেকেছে। বর্বর, অসভ্য, এশিয়ান ও আরবদের প্রাচীন সভ্যতার গর্ববোধকে, সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদাকে, জাতীয় আত্ম-বিশ্বাসকে এভাবে একটা ভয়াবহ আঘাত দেওয়া হল। আর্থিক ক্ষতির মতই অনেক বড় এ আঘাত। যে জাতি যে জনগণ তার অতীত গৌরবের স্মৃতি-সম্ভারকে সশস্ত্র গুন্ডা ও লুঠেরাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না, তাদের আত্মিক লজ্জা অপরিসীম, তাদের আত্ম-পরিচয় ক্ষত-বিক্ষত, তাদের নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিমান বিপন্ন হতে বাধ্য। জেরেমি সিব্রুক লিখেছেন "...বাগদাদের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে যখন প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার কমবেশি ১,৭০,০০০ প্রত্ন-উপাদান চুরি বা ধ্বংস করা হচ্ছিল, তাতে ইরাকি আগ্রাসনের নেতাদের কারই কেশাগ্র আন্দোলিত হয়নি। ...ইরাকে আমেরিকা শু করতে চায় একেবারে ইতিহাসহীনতা

থেকে, যেমন সে করেছিল নিজের ক্ষেত্রে, যা সে করতে চায় গোটা দুনিয়াটাকেই"। আমেরিকা ইরাকের ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কালচারাল প্রপার্টি অ্যাডভাইসরি কমিটি পদত্যাগ করেছে। তার চেয়ারম্যান মার্টিন ই. সুলিভান লিখেছেন, "...দোষ হল গিয়ে সেই সব বড় বড় পরিকল্পনার মাথাদের, যাদের চিন্তা-ভাবনায় কখনই এটা জায়গা পায়নি যে ইরাক হচ্ছে সভ্যতার সূতিকাগার, জায়গা পায়নি যে এই সংগ্রহশালাটি এবং তার সংগ্রহ শুধু ইরাকিদের সম্পদ নয়, এ সম্পদ সকলের যারা সেই আদি সভ্যতার উত্তরসূরি।" আমেরিকা লুট হতে দিল ব্যাবিলন, নিনেভার প্রাচীন সামগ্রী, সুমেরিয় মূর্তি, আসিরিয়ান স্থাপত্য, উর-র সমাধিফলক, যা ৫০০০ বছর আগের ফলক। ৩৫০০ বি. সি.-র ফুলদানি, পোড়ামাটির ফলকে লেখা প্রাচীন লিপি। বাগদাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও তার আর্কাইভ ৩০০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ভস্মীভূত। রবার্ট ফিস্ক ব্রিটেনের দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় লিখেছেন, "...মিউজিয়াম অফ আর্কিওলজির প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর ন্যাশনাল আর্কাইভ্স ও কোরানিক লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে ইরাকের সাংস্কৃতিক পরিচিতি (আইডেন্টিটি) মুছে যাচ্ছে। তাকে গোড়া থেকে শু করতে হবে"।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ, বসনিয়ার যুদ্ধ, আফগানিস্থান আক্রমণ, ইরাক আগ্রাসন, ইরান-সিরিয়া-উত্তর কোরিয়াকে হুমকি—এসবই বৃহত্তর জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে ঐ এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্টের অংশ। এনলাইটেনমেন্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমির ওপর দাঁড়িয়েই তো আফগানিস্থান আক্রমণের নাম ছিল—অপারেশান এনডিওরিং ফ্রিডম আর ইরাক আক্রমণের নাম—অপারেশান ইরাকি ফ্রিডম। ঐ যে সিনিয়র ও জুনিয়র বুশ দুজনেই বলেছিলেন,—ইরাককে 'ফ্যামিলি অফ নেশনস'-এ ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই মহান কাজের দায়িত্ব নিয়েছে আমেরিকা। ওরা দাবি করছে আধুনিকতার ন্যায্যতা। পশ্চিমি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার, প্রগতি ও সভ্যতার, আধুনিকতা ও বিজ্ঞানের, যুক্তি ও প্রযুক্তির বৈধতা। চাইছে ভাবনার, মননের, জ্ঞানের, জীবন-ধারার, জীবন-বোধের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির হোমোজেনাইজেশান। মার্কিন সরকারি দলিল, 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি অফ দি ইউ. এস. এ.' (অর্থাৎ NSSUA, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০২)-তে বলা হচ্ছে, "(বিশ শতক দিয়ে গেছে) জাতীয় সাফল্যের একক স্থিতিক্ষম (sustainable) মডেল স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, এবং অবাধ বাণিজ্য-উদ্যোগ, (এই সব মূল্যবোধকে রক্ষা করতে হবে) বিশ্ব জুড়ে, যুগ-যুগান্তর ধরে।" পশ্চিমি সভ্যতার মানদন্ডে যে রাষ্ট্র সাফল্য পায়নি, তাই হল 'ব্যর্থ রাষ্ট্র'। মার্টিন উল্ফ লিখছেন, "যদি কোনো ব্যর্থ রাষ্ট্রকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে হয়, সৎ সরকারের অত্যাবশ্যক অংশগুলোকে—সর্বোপরি বলপ্রয়োগের যন্ত্রকে—বাইরে থেকে আনতে হবে।" আফগানিস্থান, ইরাক, সিরিয়া, ইরান, লিবিয়া, কিউবা, চীন, উত্তর কোরিয়া, লেবানন, ভেনেজুয়েলা, সুদান, সোমালিয়া—মার্কিনি সভ্যতা ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মডেলের বাইরে থাকা এদের স্বতন্ত্র স্থান অনুমোদন পাবে না। ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে জর্জ বুশ "শয়তানের অক্ষ" বলেছিলেন। এগুলো নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার দেশ। কুপার লিখেছেন, "বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করার সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পথ হল, ঔপনিবেশিকিকরণ, আর এটাই অতীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।" ভিন্নত্ব, পার্থক্য, অসমসত্ত্বতা ও অপরত্ব ঐ ক্ষমতাতন্ত্রের চোখে অবাঞ্ছিত শুধু নয়, তাকে বলপ্রয়োগ করে মুছে দেবার ভাবনাও বৈধ। আটলান্টিক মান্থলি-র প্রাবন্ধিক এবং ওয়ারিয়ার পলিটিক্স গ্রন্থের রচয়িতা রবার্ট কাপলান নির্দ্বিধায় লিখতে পারেন—"আমেরিকার নরম সাম্রাজ্যগত (imperial) প্রভাবের অধীনে বিশ্বের দূরতম প্রান্তে সমৃদ্ধি আনার জন্যে" ধর্মযুদ্ধ করতে হবে। তাঁর মতে, "সাম্রাজ্য (empire)-এর একটা ইতিবাচক দিক আছে। কয়েকটি দিক থেকে এ হল শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার সবচেয়ে হিতকর (benign) রূপ"। প্রাক্তন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর জেড. ব্রেজিন্স্কি (Zbigniew Brzezinski) বলতে পারেন, সাম্রাজ্য (empire) বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রধান কাজ হল—"বশীভূত সামন্ত (vassals)-দের মধ্যে নির্ভরশীলতা বজায় রাখা ও (তাদের নিজেদের) যোগসাজশ (collusion) হতে বাধা দেওয়া, করদ রাজাদের (tributaries) সহজবশ্য (pliant) ও সুরক্ষিত রাখা, এবং অসভ্যদের (barbarians) একজোট হতে না দেওয়া"। লক্ষণীয় যে এইসব দক্ষিণপন্থী লেখকরাও 'সাম্রাজ্য' ধারণাকে ব্যবহার করছেন। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনাসমূহের সম্পাদক ম্যাক্স বুট। তাঁর প্রবন্ধ 'দ্য কেস ফর আমেরিকান এমপায়ার'-এ, তিনি আফগানিস্থান ও ইরাককে সামরিক আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-নীতির অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বলছেন—"...আত্ম-বিশ্বাসী ইংরেজরা একদা যে ধরনের আলোকপ্রাপ্ত বিদেশি প্রশাসনের ব্যবস্থা করেছিল, আজ আফগানিস্থান ও অন্যান্য অশান্তিপূর্ণ এলাকা সেটাই দাবি করছে"। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এ ঐতিহাসিক পল জনসন লিখেছেন—"ট্যাটা (obdurate) সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রগুলোকে শুধু সেনাবাহিনী দিয়ে দখল করলেই আমেরিকা ও তার মিত্রদের চলবে না, অন্তত সাময়িকভাবে হলেও বরং সেগুলোর প্রশাসনও চালাতে হবে। ঘটনাক্রমে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শুধু আফগানিস্থান নয়, বরং ইরাক, সুদান, লিবিয়া, ইরান ও সিরিয়াও। যেখানেই সম্ভব সেখানেই গণতান্ত্রিক সরকার রোপন (implant) করতে হবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে একটি পশ্চিমি রাজনৈতিক উপস্থিতি অনিবার্য বলেই মনে হয়।" ফিনান্সিয়াল টাইম্স-এর মার্টিন উল্ফ এমনকি এতদূর ভেবেছেন যে, "রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাময়িক প্রটেকটোরেটের কোনো এক রূপ অবশ্যই সৃষ্টি করা সম্ভব।" ম্যাক্স বুট চান লিগ অফ নেশন্স-এর ম্যানডেট ব্যবস্থাকে পুনর্জ্জীবিত করতে। তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে ঐতিহাসিক পল জনসন লিখছেন "আমার সন্দেহ মধ্যবর্তী পর্যায়ের সেরা সমাধান হবে পুরনো লিগ অফ নেশন্স-এর ম্যানডেট ব্যবস্থাকে পুনর্জ্জীবিত করা। দুই যুদ্ধের মাঝে ঔপনিবেশিকতার এক 'সম্মানজনক' রূপ হিসেবে এটি বেশ কাজ দিয়েছিল। সিরিয়া আর ইরাক একসময় খুব সফল ম্যানডেট ছিল।

আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা বিশেষ ধরনের সরকারের শাসনাধীনে আনা হয়েছিল সুদান, লিবিয়া ও ইরানকে। যেসব দেশ তাদের প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পারে না এবং আন্তর্জাতিক সমাজের বিদ্ধে গোপন যুদ্ধ চালায়, তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে এটা আশা করতে পারে না। এখন নিরাপত্তা পরিষদের সকল স্থায়ী সদস্যের সমর্থন বিভিন্ন মাত্রায় আছে মার্কিন উদ্যোগের পেছনে। সুতরাং একটা নতুন রূপের রাষ্ট্রসঙ্ঘের ম্যান্ডেট চালু করা কঠিন হবে না যেটা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রগুলোকে দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানের অধীনে আনতে পারবে।" হায়! আমেরিকা নিজে তার প্রতিবেশী কিউবা, চিলি, এল সালভাদর, মেক্সিকো, বলিভিয়া, পে, নিকারাগুয়া, পানামা-তে কী করেছে? আন্তর্জাতিক সমাজের বিদ্ধে হিরোশিমা-নাগাসাকি, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, সি. আই. এ.-র বিজোড়া ষড়যন্ত্র, বীভৎস পরিবেশ দূষণ, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, অস্ত্র উৎপাদন, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, ইরাক আগ্রাসন কী না করেছে? ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা তার এক রিপোর্টে লিখেছে, ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ মার্কিন প্রশাসনের যেসব লোক পশ্চিম এশিয়ায় "গণতন্ত্র-নির্মান"কর্মসূচি চাইতেন তাঁদের মুখ খুলে দিয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর কনডোলিসা রাইস বলেছেন, ইরাককে "একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র" হিসেবে পুনর্গঠিত করার কর্মে আমেরিকা "সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত" ("completely devoted") থাকবে। নিউ ইয়র্ক টাইমস এর ১১ অক্টোবর ২০০২-এর প্রবন্ধে বলা হয়েছে, আমেরিকা ইরাকে "নৈরাজ্য না থাকার জন্যে নিশ্চয়তা চায়" ("to ensure against anarchy")। ঐ প্রবন্ধ অনুসারে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট প্রাচ্য, দক্ষিণপশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জালমে খলিল্জাদ বলেন, "ইরাক বিজয় ও দখল আমাদের ইচ্ছে নয়। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এবং ইরাককে একটা গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্যে প্রস্তুত করা এবং তারপরে সময়ের সাথে সাথে তাকে গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলা—এর জন্য যা দরকার আমরা করব।" পূর্বোক্ত nssusa দলিলে বলা হয়েছে "(এ হল) আমেরিকার সুযোগের সময়...বিশ্ব জুড়ে স্বাধীনতার সুফল প্রসারিত করার সুযোগের এই মুহূর্তকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজে লাগাবে। বিশ্বের প্রতিটি কোনে অবাধ বাণিজ্য, অবাধ বাজার, উন্নয়ন, ও গণতন্ত্রের আশা আনার জন্যে আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করব"। বুশরা বলছেন, এ যুদ্ধ ইরাকে

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। গণতন্ত্রের চমৎকার ধারণা বটে! ইরাকের শাসক কে হবেন, সেটা ইরাকি জনগণ ঠিক করছেন না, পেন্টাগন এবং সি. আই. এ. ঠিক করছে। ১৯৯৮-এ পাশ করা ইরাকি লিবারেশান বিলে মার্কিন প্রশাসন ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদের একান্ত দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করেছে। যদি ফুকোর অনুশাসন-তন্ত্রের কথা ভাবি, যদি নেগ্রি ও হার্টের 'সাম্রাজ্য'-এর ধারণাকে মানি, তাহলে অবশ্য বুঝতে হবে আমেরিকা সত্যিই গণতন্ত্র চায় ইরাকে। অবশ্যই পশ্চিমি বা মার্কিনি আধুনিক ধাঁচের গণতন্ত্র যেখানে "অবাধ বাণিজ্য, অবাধ বাজার, উন্নয়ন" থাকবে। শান্তিপূর্ণ, প্রতিষ্ঠান-নির্ভর এ ধরনের শাসনব্যবস্থা বিশ্বের সর্বত্র গড়ে তুলতে পারলে "সাম্রাজ্য" মসৃণভাবে সচল থাকতে পারবে। একধরনের পশ্চিমি হোমোজেনাইজ্‌ড গণতন্ত্র তাই সত্যিই ওদের কাম্য।

আমেরিকা সত্যিই গণতন্ত্র চায় বিশ্বজুড়ে সব দেশে। তবে সে গণতন্ত্র আমেরিকার ভাবনা মতো গণতন্ত্র। মার্কিন রাজনৈতিক ভাবধারা, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, নির্বাচন, সরকারি ও প্রশাসনিক কর্মধারা হল গণতান্ত্রিক। তার থেকে ভিন্ন রাজনীতিকে সে গণতান্ত্রিক বলে মানতে অক্ষম। যা কিছু মার্কিন ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভিমুখী, তাই হল গণতান্ত্রিক। তার থেকে অন্যরকম, আলাদা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তাদের কাছে অগণতান্ত্রিক। সমরূপী সমসত্ত্ব; পশ্চিমি সভ্যতার সুনির্দিষ্ট মান সঙ্গত; মার্কিনি সংস্কৃতি—রাজনীতি—অর্থনীতির প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত রূপরেখার মধ্যে বিচরণকারী, মার্কিনি বহুত্ববাদি কাঠামো ও বাহ্যিক গণতন্ত্রের ছাঁচ-অনুসারী; এমনকি একমেকেন্দ্রিক—এমন একটি বিশ্ব তার চাই। একক আধিপত্যের স্বপ্ন চোখে নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্র-চৈতন্যের অমোঘ দাবি নয়া শতাব্দী চাই, তা হবে আমেরিকার শতাব্দী। জর্জ বুশ ২০০১ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস আগেই সেপ্টেম্বর ২০০০-এ দক্ষিণপন্থী লোকদের গোষ্ঠী একটি রিপোর্ট তৈরি করে। গোষ্ঠীর নাম 'project for the new American Century' (pnac)। গোষ্ঠীতে ছিলেন—ডিফেন্স পলিসি বোর্ডের বর্তমান অধ্যক্ষ রিচার্ড পার্লে, ডিক চেনি (বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেন্ট), রামসফেল্ড (ডিফেন্স সেক্রেটারি), পল উলফোউইট্স (ডেপুটি ডিফেন্স সেক্রেটারি) প্রমুখ। রিপোর্টের শিরোনামা-"রিবিল্ডিং অ্যামেরিকা'স ডিফেন্সেস স্ট্রাটেজি, ফোর্সেস এন্ড রিসোর্সেস ফর এ নিউ সেঞ্চুরি"। ঐ রিপোর্টে বলা হয়—"it is time to increase the presence of American forces in southeast Asia"। এটি সহায়তা করবে কাকে? কী উদ্দেশ্যে? তার উত্তরে বলা হচ্ছে—"American and allied power providing the spur to the process of democratisation in চীনে"। পূর্বোক্ত nssusa দলিলে বলা হয়েছে চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আমেরিকার মাথাব্যথার কথা—"ঐ জাতিকে তার নাগরিকদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সত্যিই দায়িত্বশীল করতে...অনেক কিছুই করা বাকি রয়ে গেছে"।

এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের জ্ঞানতত্ত্বে সেসব ধারণাগত বর্গ (ক্যাটেগরি) প্রাধান্য বিস্তার করেছিল সেগুলির বৈশিষ্ট্য হল তারা নিজেদের ইউনিভার্সাল বা বিশ্বজনীন ক্যাটেগরি বলেই সংজ্ঞায়িত করত। ক্ষমতার এষণা ঐ জ্ঞানতত্ত্বের অঙ্গ। স্বাভাবিকভাবেই সেদিন কলোনির জ্ঞানতত্ত্বকে অজ্ঞানতার বেশি কিছু বলে ভাবা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর আজও পোস্টকলোনি, তৃতীয় বিশ্ব, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার জ্ঞানতত্ত্ব, সংস্কৃতি, রাজনীতি পশ্চিমি আধুনিকতার দ্বারা পদানত, অবদমিত। আধুনিক নেশন-স্টেটের ভয়ংকর ক্ষমতা-লিপ্সা তো যুক্তি-সর্বস্ব এন্‌লাইটেনমেন্ট দ্বারা অনুমোদিত, বৈধতা-প্রাপ্ত। ঐ আধুনিক যুক্তি যে এশীয় রাষ্ট্রকে যথেষ্ট আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ভাবে না, তাকে আক্রমণ ন্যায্যতা-মন্ডিত। আজ তেমন কয়েকটি ক্ষমতাবান নেশন-স্টেট যথা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন হিংস্র কামড় বসিয়েছে অন্য দুর্বল অ-পশ্চিমি 'ব্যর্থ' নেশন-স্টেটের শরীরে। ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে বিশ্বজনীন মানবতাবোধ ও মানবাধিকারের যুক্তি দেখিয়ে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে, আহত ব্যাঘ্রের মতো আরও বড়ো সন্ত্রাসবাদী মার্কিন নেশন-স্টেটটি আক্রমণ করেছে কৌমকে, লোক-সংস্কৃতিকে, ধর্মকে। সনাতন ও প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্যকে। পশ্চিমি আধুনিকতার স্বাভাবিক মানদন্ডেই এইসব প্রাক্-আধুনিক, অনাধুনিক, অসম্পূর্ণ-আধুনিক, অযুক্তি, চালিত অসভ্য, বর্বর কৌম ও রাষ্ট্র আক্রমণের যোগ্য। 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র' (rogue state), 'ব্যর্থ রাষ্ট্র', 'স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র', 'অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র', 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' বলে তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন বৈধ। আমেরিকা আক্রমণ করেছে এমনকি এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের পরম আদরের সন্তান পশ্চিমি লিবারেল তত্ত্বের চোখের মণি, পৌর সমাজ (সিভিল সোসাইটি)কে, তার ব্যক্তিমর্যাদা, নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশ ও মিডিয়ার স্বাধীনতাকে। এমন কি নেশন-স্টেটদের মহা ভোজসভা রাষ্ট্রসঙ্ঘকেও। মানবাধিকার ও বিশ্বজনীন আদর্শের মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রেখে উদ্ভূত হয়েছে এক নতুন ধরনের আলোকোজ্জ্বল সাম্রাজ্যবাদ। কুপার লিখেছেন—"সুতরাং যা দরকার তা হল একটা নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ, এমন যা বিশ্বজনীন (cosmopolitan) মূল্যবোধ এবং মানবাধিকারের জগতে গ্রহণযোগ্য।" বিশ্বজনীন মূল্যবোধ মানে ইউরোপীয় এন্‌লাইটেনমেন্টের মূল্যবোধ। অর্থাৎ ১৮ শতকের পশ্চিম ইউরোপ গণতন্ত্র, প্রগতি, স্বাধীনতা, পৌর সমাজ, নাগরিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি বলতে যা কিছুকে বুঝত, তাকেই তারা বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করত। এখনও করে।

তাই আমেরিকা কথা বলছে সভ্যতা, গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক সমাজের নিরাপত্তা, ইরাকি জনগণের মুক্তির ভাষায়। বুশ ইরাক আক্রমণের কারণ দেখিয়েছেন—(১) ইরাকের গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র এবং রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র আছে যা বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে। (২) ইরাক সন্ত্রাসবাদ বিশেষত আলকায়দা ও লাদেনের সঙ্গে জড়িত। সভ্য জগতের গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার কাছে তাই সে অপাংক্তেয়। (৩) তার অস্ত্রগুলি আমেরিকা ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদস্বরূপ। (৪) ইরাক পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে যা মানবতা ও সভ্যতাকে বিপন্ন করবে (৫) ইরাকের জনগণকে সাদ্দাম হোসেনের স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। এ কথাগুলোর মাধ্যমে আমেরিকাকে একটা হেজিমনিক ডিসকোর্স গড়ে তুলতে হচ্ছে। তা হল—সভ্যতা-র শত্রু ও বিপদ হল সাদ্দাম। আর এই কথাগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেই ১৮ শতকের ইউরোপীয় এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের ইউনিভার্সাল ট্রুথ ক্লেমের ওপর। আমেরিকা-ব্রিটেনের ডিসকোর্সে বারে বারে সভ্যতা, মানবতা, নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, মুক্তি—একথাগুলো আসছে। nssusa দলিলে বলা হয়েছে, (আমেরিকার কর্তব্য হল) "গণতন্ত্রের পরিকাঠামো তৈরি করা ও সমাজগুলোকে উন্মুক্ত করে তোলা" এবং "আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলভাবনা (key themes) হল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ ও স্বাধীনতা"।

এটা কোনো ব্যক্তি-দার্শনিকের দোষগুণের প্রশ্ন নয়। এ একটা সমগ্র বৌদ্ধিক আন্দোলনের—জ্ঞানচর্চার একটি বিশেষ ঐতিহ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একথা ঠিক আলোক প্রাপ্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক উপাদান থাকতেই পারে, কিন্তু সব মিলিয়ে তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন চরম সত্যের একমাত্র মালিক বলে নিজেকে ভাবার দম্ভ। এতো এক ধরনের মৌলবাদ বটেই, যুক্তির মৌলবাদ যা গড়ে তোলে প্রতিষ্ঠানকে আর গড়ে ওঠে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। তার সাথে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত থাকে ভয়ংকর এক আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় তন্তুজাল। ক্ষমতা ও জ্ঞান, ক্ষমতা ও সত্য, ক্ষমতা ও যুক্তি সেখানে একাকার। এই সদম্ভ ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে নিজের অজান্তেই বিদেশি, অচেনা অজানা জীবনধারাকে যুক্তি-বর্জিত, অশিষ্ট, বর্বর বলে মনে করে। অপর যুক্তি তার কাছে অ-যুক্তি। উপনিবেশের মানুষ তার কাছে অসভ্য, বর্বর। প্রাচ্য জ্ঞান তার কাছে অজ্ঞানতা, অ-বিজ্ঞান। আজও তাই আধুনিক পশ্চিমি বুদ্ধিজীবী ও সরকারি আমলারা গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, পবিত্র মানবাধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সভ্যতা, যুক্তিবাদ ও আইনের শাসনের যুক্তি দেখিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার চাপে প্রান্তে নির্বাসিত করে 'দুর্বৃত্ত' সবাইকে। মানবতা, মানব-মর্যাদা, মানবাধিকারের কথা বলে তারা নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের মূল্যবোধকে চাপিয়ে দেয় সবার ওপরে। মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তি-মালিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানব মর্যাদার দাবি। nssusa দলিলে বলা হচ্ছে—"মানব-মর্যাদার যেসব দাবি নিয়ে কোনো দর-কষাকষির সুযোগ নেই, (তাদের মধ্যে) রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা।" আজকাল পেপসি, কোকোকোলার মতো মার্কিন বহুজাতিকও বহুসংস্কৃতি, এথ্‌নিক কালচার, সাংস্কৃতিক বহুত্ব এসবকে গুরুত্ব দেয়। আসলে ততদূর পর্যন্ত বহুত্ব, পার্থক্যকে সহ্য করা হবে যতক্ষণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে, কারণ তা মানব-মর্যাদার প্রশ্ন।

ঐ 'মানব' যে আসলে একটি মার্কিন মান-অনুসারী মানব সেটা চেপে যাওয়া হয়। বোরখা ঢাকা ইরাকের মেয়ে নিপীড়িত, বন্দিনী, তার স্বাধীনতা নেই। বোরখা ছেড়ে পশ্চিমি পোষাক পরলে সেটাই তার মুক্তি? আধুনিক পশ্চিমি পোষাক নিজেকে বিজনীন আধুনিকতা ও মুক্তির সাথে এক করে দেখছে। এরকমভাবে দেখতেই তো সে অভ্যস্থ। ইসলামিক ধর্মগুর নির্দেশ মেনে কঠোর জীবন-ধারণ হল প্রাচ্য গোঁড়ামি, অ-যুক্তির প্রাধান্য। ধর্মগু ছেড়ে মার্কিনি মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন সংস্থার বর্ণময়, সূক্ষ্মতর, অদৃশ্য ছাঁচে নিজের চাহিদা, চি, অভ্যাস ও মননকে গড়ে উঠতে দিলে সেটা স্বাধীনতা, যুক্তিবাদ, স্ব-নির্ভরতা? মার্কিনি সংস্কৃতির মানদন্ডে ভোগবাদী বুর্জোয়া সংস্কৃতির ছায়াতলে যে প্রয়োজনবোধ নির্মিত হয়, তা স্বাভাবিক ও বিজনীন? সাদ্দামের স্বৈরতন্ত্রে নাগরিক অধিকার নেই, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত। শাসিতের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ উপেক্ষিত। সেই স্বৈরতন্ত্র ছেড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতের পুতুল কোনো সরকারের পশ্চিমি রাজনৈতিক আধুনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। আর তা না করলে সন্ত্রাসবাদ। nssusa দলিলে বলা হয়েছে—"(আমেরিকা সমর্থন করবে) মধ্যপন্থী ও আধুনিক সরকারকে, বিশেষত মুসলিম দুনিয়ায়, যাতে এটা সুনিশ্চিত করা যায় যে সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ জোগায় এমন শর্তাদি ও মতাদর্শ যেন কোনো জাতির মধ্যে উর্বর ভূমি খুঁজে না পায়।" হায়, আমেরিকাই যে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে উর্বর ভূমি!

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এত রাখ-ঢাক না করে খুব স্পষ্ট করেই ওঁরা বলেছেন প্রাক্-আধুনিক হওয়াটাই অপরাধ। প্রাক্ আধুনিক দুনিয়া মানেই 'ব্যর্থ রাষ্ট্রে'-র দুনিয়া। ম্যাক্স ওয়েবারের সযত্ন-রচিত বৈধ বলপ্রয়োগের মানদন্ডও শর্ত পূরণ করতে তারা যে একেবারেই ব্যর্থ। আধুনিক পশ্চিমি রাষ্ট্র এশিয়ার "প্রাক আধুনিক" রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতেই পারে। তার পেছনে তাত্ত্বিক বৈধতা জোগায় আধুনিকতাবাদী ডিসকোর্স। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ারের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা রবার্ট কুপার এবং লন্ডনের ফিনানশিয়াল টাইমস্ পত্রিকার মুখ্য অর্থনৈতিক ভাষ্যকার মার্টিন উলফ্ লিখেছেন, আফগানিস্থানের মতো ''pre-modern states'' গুলোর দিক থেকে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর বিপদের ভয় আছে। লিখেছেন—''The pre-modern world is a world of failed states. Here the state no longer fulfils weber's criterion of having the monopoly on the legitimate use of force''। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল ''some areas of the former soviet union...including chechnya. All of the world's major drug-producing areas...Until recently there was no real sovereign authority in afghanistan; nor is there in upcountry Burma or in some parts of South America...All over Africa countries are at risk. No are a of the world is without its dangerous cases...''। এইসব দুর্বল রাষ্ট্রগুলো কী করে প্রবল ক্ষমতাবান আমেরিকা ও ব্রিটেনের পক্ষে বিপদস্বরূপ হতে পারে? আসলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও রাষ্ট্রের চেনা ছকের বাইরে যা কিছু তাই ওদের কাছে ভয়ঙ্কর, অজানা, সন্ত্রাসবাদের আড্ডা, মাদক-কেন্দ্র। এই চিন্তাখাতে ভাবতে থাকলে আমরা ভুলে যাই আধুনিক মার্কিন রাষ্ট্র হল সন্ত্রাসবাদের পীঠস্থান, সি. আই. এ., পেন্টাগন, এফ. বি. আই. হল বিদেশে ভয়াবহ হিংসা, অস্ত্র ও মাদক চালানে অর্থ জোগানদার, গোপন ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক হত্যা, বিপুল অর্থ ঘুষ ইত্যাদির কেন্দ্র। আধুনিক পশ্চিমি অর্থনীতি অনুসরণ করতে না পারলেও সে ব্যর্থ রাষ্ট্র। পশ্চিমি শক্তিগুলো চায় সভ্য, শিষ্ট, সুশীল, সুশাসিত, স্থিতিশীল, প্রতিষ্ঠান-নির্ভর, আইনানুগ, গণতান্ত্রিক, নিয়মনিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর পৃথিবী। সেখানে পশ্চিমি বিশেষত মার্কিনি ছকে চলবে রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি। কুপার চান, "এমন এক বিশ্ব যেখানে কর্মদক্ষ ও সু-শাসিত রপ্তানির স্থিতিশীলতা এবং স্বাধীনতা আছে, এবং যা বিনিয়োগ ও বৃদ্ধির জন্যে উন্মুক্ত।" তাই উপনিবেশকরণ তাঁর কাছে জরি—"উনিশ শতকের মতোই (আজও) উপনিবেশকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যারা বিশ্বায়িত অর্থনীতির বাইরে পড়ে রইল, তারা একটা বিষচক্রে ঢুকে গেল এ ঝুঁকি থাকছে। দুর্বল সরকার মানেই বিশৃঙ্খলা এবং তার অর্থ ক্রমহ্রাসমান বিনিয়োগ"। তৃতীয় বিশ্ব গণতন্ত্রের অর্থ মার্কিনিদের কাছে আলাদা। এর অর্থ এমন শাসন-ব্যবস্থা যা মার্কিনিদের সব শর্ত মেনে নেবে, নিজের দেশকে মুক্ত বাণিজ্যের নামে MNC গুলোর লুণ্ঠনক্ষেত্রে পরিণত করবে। নিজের দেশের অতীত গৌরব-চিহ্ন ও ঐতিহ্যকে লুঠ হতে দেবে ও মার্কিনি সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অনুকরণ করবে। আর যারা তার বিরোধিতা করবে, তাদের জেলে পুরবে।

৬. ফুকো ঃ ক্ষমতার ত্রিভুজ

ইরাক যুদ্ধের মানে কিন্তু এই নয় যে আমেরিকা যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে পুরনো দিনের মতো উপনিবেশ স্থাপন করে চলতে চাইছে। না, তা সে চাইছে না। কারণ তেমন হিংসা, বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধ ততটা ইকনমিক কখনই হয় না। বরং প্রধানত তারা চায় বিশ্ব জুড়ে সুসভ্য, উন্নত, সুশীল, আধুনিক, গণতান্ত্রিক, পাশ্চাত্য ধাঁচের, যুক্তিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী অর্থনীতি, মুক্ত বাজার, অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিমালিকানা, পৌর সমাজ নিয়ে গঠিত। ধর্মীয় গোঁড়ামি-মুক্ত আধুনিক ভোগবাদী সংস্কৃতি চায় বিশ্বায়ন ও বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা সুসভ্য, বৈধ, শান্তিপূর্ণ, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে উঠুক। আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের হেজিমনিক ডিসকোর্স সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। এই আধুনিক ক্ষমতা অনেক বেশি ইকনমিক অর্থাৎ তা চালানোর সবধরনের ব্যয় অনেক কম। তাই আমেরিকার বিশ্বব্যাপী ক্ষমতাতন্ত্র ফুকো-বর্ণিত অনুশাসন (ডিসিপ্লিনারি রেজিম) ও প্রশাসনিকতা (গভর্নমেন্টালিটি)-র মাধ্যমে শান্তিতে শাসন চালাতে চাইবে। চাইবে, ক্ষমতা ও শৃঙ্খলা হোক অন্তর্লিনীকৃত (internalized)। মনন-নিয়ন্ত্রণ চলুক যাতে হিংসা, যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগ তার নগ্নরূপে দরকার না হয়। কিন্তু চাইলেই তো হল না। সভ্য, বৈধ ক্ষমতাতন্ত্রের মসৃণ প্রাতিষ্ঠানিকতার সাথে মাঝে মাঝেই দু'চারটে আফগানিস্থান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া কি উত্তর কোরিয়া এই বিশ্বায়িত আধুনিক সভ্যতার বাইরে ছিটকে গেলে, তাদের সন্ত্রাসবাদী, অসভ্য, বর্বর, স্বৈরাচারী, স্বাধীনতার শত্রু, মানব সভ্যতার বিপদ বলে বোমা মেরে শাসন করা হবে। অর্থাৎ ফুকো-বর্ণিত সার্বভৌম কেন্দ্রীয় ম্যাক্রো-স্তরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, হিংসা ও বল প্রয়োগকেও প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে। ফুকো যে ক্ষমতার ত্রিভুজের কথা বলেছিলেন, তাই দিয়েই বর্তমান বিশ্ব ক্ষমতার প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। অবাধ্য ইরাককে শাসন করে আবার টেনে নেওয়া হবে আধুনিক পাশ্চাত্য ক্ষমতাতন্ত্রের বুকে। বিশ্বায়ন, বিশ্ব পুঁজিবাদ, আধুনিক যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র ও সভ্যতার ছকের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দাও। তোমার কোনো ভয় নেই। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য দুটির চরম রূপকে নমনীয় করে বুঝলে, এদুটি পরস্পর অতি-নির্ণীত।

ফুকো ক্ষমতার ৩টি মাত্রার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (ক) সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) (খ) অনুশাসন (Discipline) এবং (গ) প্রশাসনিকতা (Governmentality)। ফুকোর আগে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার যে ঘরানা চালু ছিল তাকে ফুকো juridico-Discursive Tradition বা আইনি-আলোচনার ঘরানা বলেছেন। ক্ষমতার প্রচলিত এই মাত্রাটিকে বলা হয় সার্বভৌমত্ব। এ হল সনাতন রাষ্ট্রক্ষমতা। ইরাক যুদ্ধকে ঘিরে বর্তমান বিশ্ব ক্ষমতার প্রকৃতি বিচারের ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা এই সনাতন রাষ্ট্রক্ষমতা ও সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে গুত্ব দিয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ফুকোর মতে এখানে ক্ষমতার এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে যার প্রতিভূ রাজা বা আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক, যথা মার্কিন রাষ্ট্রপতি। এই ঘরানার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা ও উদাহরণ আইনতত্ত্বের আদলে গঠিত। এই ঘরানা অনুসারে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা হয় কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর বা কোনো নির্দিষ্ট প্রজামণ্ডলীর ওপর। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান প্রকাশ হল আইন প্রণয়ন করা, প্রণীত অ

াইনকে প্রয়োগ করা, আইন লঙঘনকারীকে শাস্তি দেওয়া। এই ঘরানা অনুযায়ী, আইন না মানলে ধরা হবে দেশের সার্বভৌম শক্তির বিদ্ধাচরণ করা হচ্ছে। কারণটা সহজ। আইন সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছেকে প্রকাশ করে। ক্ষমতা ছিল রাজার বা রাষ্ট্রের আইনের মতো। অর্থাৎ ক্ষমতা ছিল না বলতে পারার ক্ষমতা। কারাগারে বা জাদের কাছে পাঠানোর ক্ষমতা। রাষ্ট্র ক্ষমতা বলতে সাধারণভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার কথাই ধরা হয়। ফুকোর মতে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষমতা-বিন্যাস অ ালোচনায় এই ঘরানা কাজে লেগেছিল। কিন্তু ১৮—১৯ শতকে ইওরোপে ক্ষমতার বিন্যাসে যেসব গুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল তার আলোচনায় এই ঘরানা ততট া ফলপ্রসূ নয়। ঐ প্রচলিত আইনি-আলোচনার ঘরানায় ক্ষমতা একটি সুস্পষ্ট কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হত। বিচ্ছুরিত হত ঐ কেন্দ্র থেকে। সেটা বদলালো।

ফুকো দেখিয়েছেন, ১৭ শতক থেকে শু করে জীবনের ওপর প্রযুক্ত নতুন ক্ষমতা ২টি মূল রূপে বিবর্তিত হয়। এ রূপগুলো অবশ্য বিপরীত (antithetical) নয়। বরং তারা বিকাশের দুটি মেকে গড়ে তোলে। মেদুটি আবার বিভিন্ন সম্পর্কের এক সমগ্র অন্তর্বর্তী গুচ্ছ দ্বারা যুক্ত। প্রথমে গঠিত মেটি শরীরকে কেন্দ্র করে অবস্থিত। শরীর যেন এক যন্ত্র। তাকে শৃঙ্খলায়িত করা, তার সামর্থ্যগুলোকে সবচেয়ে কাম্য স্তরে আনা (optimize), তার শক্তিগুলোকে জোর করে আদায় (extortion) করা, তার সহজবশ্যতা (docility) এবং উপযোগিতাকে সমান্তরালভাবে বাড়ানো, কর্মদক্ষ ও ব্যয়সংকোচকারী (economic) নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে তাকে জড়িয়ে নেওয়া, এইসব কিছু নিশ্চয়তা পেল ক্ষমতার কিছু পদ্ধতির দ্বারা। তাকে বলা যায়—অনুশাসন ঃ মানব শরীরের ব্যবচ্ছেদ-র াজনীতি (disciplines : an anatomo-politics of the human body)। কিছু পরে গঠিত দ্বিতীয় মেটি প্রজাতি-শরীর (species body)-এর ওপর কেন্দ্রীভূত। সে শরীর জীবনের যন্ত্রকৌশল (mechanics) দ্বারা উদ্বুদ্ধ। কিছু জৈব-প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে সেটি কাজ করে। ঐ প্রক্রিয় াগুলো হল বংশবিস্তার, জন্ম ও মৃত্যু, স্বাস্থ্যের স্তর, প্রত্যাশিত আয়ু ও আয়ুষ্কাল। এর মধ্যে সেসব শর্তগুলোকেও ধরতে হবে যেগুলোর জন্যে এই প্রক্রিয়াগুলো আল াদা আলাদা হয়। এগুলোর তত্ত্বাবধান কার্যকর করা হত হস্তক্ষেপের এক পুরো তালিকা এবং নিয়মনকারী নিয়ন্ত্রণ (regulatory control)-এর মাধ্যমে। ঐ নিয়মনকারী নিয়ন্ত্রণ হল জন-সমষ্টির জৈব-রাজনীতি (regulatory controls : a bio-politics of the population)। শরীরের অনুশ াসনগুলো (disciplines) আর জন-সমষ্টির নিয়মনসমূহ (regulations) গঠন করল সেই দুটি মেকে যাদের ঘিরে জীবনের ওপর ক্ষমতার সংগঠনকে নিয়োজিত করা হল। ধ্রুপদী যুগে, এই মহা দ্বি-মেভিত্তিক প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠা একটা নতুন ক্ষমতাকে চিহ্নিত করল। ঐ প্রযুক্তি ব্যবচ্ছেদী (anatomic), ও জৈবধর্মী (biological), ব্যক্তিনির্মাণকারী এবং নির্দ্দিষ্টকরণকারী, শরীরের কোনো কিছু সম্পাদনক্রিয়ার প্রতি নিবদ্ধ, জীবনের প্রক্রিয়াগুলির প্রতি মনোযোগী। আর ঐ নতুন ক্ষমতার সর্বোচ্চ কাজ আর বোধহয় হত্যা করা নয়, বরং সর্বাংশে জীবন মণ্ডিত করা (invest life)।

ফুকোর মতে, মৃত্যুর পুরনো ক্ষমতার প্রতীক ছিল সার্বভৌম ক্ষমতা, তা এখন সাবধানে স্থানচ্যুত হল শরীর প্রশাসন দ্বারা এবং জীবনের হিসেবি ব্যবস্থাপনার দ্বারা। ধ্রুপদী কালে, বিভিন্ন ধরনের অনুশাসনের দ্রুত বিকাশ ঘটল—বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যারাক, ওয়ার্কশপ; একই সাথে, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে, কিছু সমস্যারও উদ্ভব ঘটল, যথা—জলসেচ, আবাসন, জনস্বাস্থ্য, আয়ুষ্কাল, ও জন্মহারের সমস্যা। এর ফলে অসংখ্য ও বহুবিচিত্র প্রকৌশল (techniques)-এর বিস্ফোরণ ঘটল। তাদের উদ্দেশ্য হল শরীরকে পরাভূত ও বশীভূত করা এবং জনসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা। এগুলোর সাথে স াথেই শু হল জৈব-ক্ষমতা (bio-power)-এর যুগের শু। এর বিকাশের দুটি অভিমুখ ছিল। সে দুটিকে ১৮ শতকেও স্পষ্ট ভাবে আলাদা আলাদা করে দেখা গেছিল। প্রথমত, অনুশাসনের ক্ষেত্রে, এই বিকাশ মূর্ত্ত হয়েছিল কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে, যথা—সেনাবাহিনী, স্কুল। কয়েকটি চিন্তাভাবনায়, যথা—কৌশল, শিক্ষ ানবিশী, শিক্ষা, সমাজের প্রকৃতি নিয়ে ভাবনা। আর দ্বিতীয়ত, জন-সমষ্টি নিয়ন্ত্রণ (population control) বা প্রশাসনিকতার ক্ষেত্রে, দেখা গেল জন পরিসংখ্যান-তত্ত্ব (demography)-র উদ্ভব, সম্পদ ও বাসিন্দাদের মধ্যেকার সম্পর্কের মূল্যায়ন, ধন-সম্পদ ও তার আবর্তন (circulation)-এর বিশ্লেষণ করে সারণি (tables) তৈরি।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ করে ফুকো মন্তব্য করেছেন, এই জৈব-ক্ষমতা নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদের বিকাশে এক অপরিহার্য উপাদান ছিল। পুঁজিবাদ সম্ভবই হত না যদি দুটি ক াজ না করা হত। কাজ দুটি হল (১) উৎপাদনের যন্ত্র (machinery)-এর মধ্যে শরীরের নিয়ন্ত্রিত প্রবেশকরণ (insertion); (২) অর্থনৈতিক প্রক্রিয় াগুলোর সাথে জনসমষ্টির বিষয়টিকে মানিয়ে নেওয়া। পাশ্চাত্য মানুষ ক্রমশ শিখছিল একটা জীবন্ত বিশ্বে একটা জীবন্ত প্রজাতি হওয়ার অর্থ কী, একটা শরীর থাক ার, অস্তিত্বের শর্তাবলী, জীবনের সম্ভাবনা থাকার, একটা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ, পরিবর্তনযোগ্য শক্তিগুলি, এমন একটা পরিসর (space) যেখানে ত াদের একটা সবচেয়ে সন্তোষজনকভাবে বণ্টন করা যাবে—এসব থাকার অর্থ কী। ইতিহাসে এই প্রথম, নিঃসন্দেহে, রাজনৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে জৈব অস্তিত্ব প্রতিফলিত হল। সুস্পষ্ট হিসেব-নিকেশের জগতে জীবন ও তার কর্মপ্রক্রিয়া (mechanisms)-কে নিয়ে আসা এবং জ্ঞান-ক্ষমতা যুগ্মকে মানবজীবনের রূপ ান্তরের একটা এজেন্টে পরিণত করা—এ দুই ঘটনা একসাথে হল জৈব-ক্ষমতা। তবে এটা ঘটনা নয় যে জীবনকে শাসন ও প্রশাসন করে যেসব প্রকৌশল, তাদের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে একীভূত (integrated) করা গেছে। জীবন নিরন্তর তাদের হাত থেকে পালিয়ে যায়। এই বায়ো-পাওয়ার ও বায়ো-পলিটিকসের কথাই নেগ্রি ও হার্টের 'সাম্রাজ্য' ধারণায় প্রযুক্ত হয়েছে। আগে ক্ষমতাকে দেখা হতো মুক্তির পথে বাধা। তার কাজ নেতিবাচক। ফুকো দেখালেন ক্ষমতার ইতিবাচক ভূমিকাও আছে। এমন কায়দায় ব্যক্তির শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তা চূড়ান্তভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। ব্যক্তি ক্ষমতার বিপরীত নয়, তারই অন্যতম প্রধান পরিণতি। ক্ষমতার দ্বারা গঠিত ব্যক্তি যুগপৎ তারই বাহন। ক্ষমতাকে তাই সামর্থপ্রদায়ী (enabling) অর্থে বুঝতে হবে। ক্ষমতা উৎপাদনশীল (productive), জীবন-বৃদ্ধিকারী (life-enhancing), জীবন সংরক্ষণকারী (life preserving)। ক্ষমতা যে কেবল দমন করে, পীড়ন করে তা- ও তো নয়। এই ক্ষমতা-বিন্যাস আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ও সার্বিকভাবে সুখপ্রদায়ী বটে। ফুকোর মতে মিথ্যে নয় সেই সব সুখ। জনসমষ্টির প্রশাসনিকতার ক্ষেত্রেই তো দেখা যাচ্ছে, এক অর্থে যা বৃহদত্ত্বের সমস্যা, সংখ্যাতত্ত্বের, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ও সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই তো আবার অন্য অর্থে ব্যক্তি বিশেষের জীবনের একেবারে ব্যক্তিগত বিষয় যৌনতা, প্রেম, বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব। বৃহদাকারে দেখলে যা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিচালনার ও নিয়ন্ত্রণের বিষয় মনে হবে, ব্যক্তির কাছে তাই আসতে পারে সুখের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বার্তা নিয়ে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে আধুনিক ব্যক্তিমানুষ বলে যাকে ভাবা হয়েছে উদ ারনৈতিক বা গণতান্ত্রিক চিন্তায়, যৌনতা-প্রেম তার ব্যক্তিগত জীবন ও স্বাধীনতার অংশ। ফুকো বলছেন না যে এ স্বাধীনতা মেকি। বরং বলছেন এই নতুন ক্ষমতা-বিন্যাস, জৈব-ক্ষমতা এমনই যে তার সাফল্য নির্ভর করে ব্যক্তিকে ব্যক্তি হয়ে ওঠার কতকগুলো প্রক্রিয়া শেখানোর ওপর।

মানব-বিজ্ঞানগুলোর বিকাশের সময়ে এবং তাদের মধ্যে থেকেই যেসব প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করে তাদেরই ফুকো জৈব-ক্ষমতা বলছেন। মানব শরীর ও তার অ াচরণকে সংজ্ঞায়িত, নিয়মন (regulation), নিয়ন্ত্রণ (control) ও বিশ্লেষণ করা তার উদ্দেশ্য। সার্বভৌমত্বের প্রাধান্যের কালে, রাষ্ট্রের গৌরব, ক্ষমতা, শক্তি ও ধনসম্পদ গুত্ব পেত। এখন তার জনসাধারণকে সম্পদ (resources) হিসেবে দেখা হল। ঐ সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, প্রাত্যাহিক জীবনে, যত্নসহকারে ত

ার বিকাশ ঘটাতে হবে। জনসমষ্টির উৎপাদন ক্ষমতা ও সামর্থ বাড়াতে হবে। তাই তাদের জন্যে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য চাই। সেজন্যে চাই তাদের সম্বন্ধেয াবতীয় তথ্য ও জ্ঞান। আর চাই উপযুক্ত প্রশাসনিক যন্ত্র। এভাবেই জৈব ক্ষমতা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এর সাহায্যে জনসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। রাষ্ট্রের মানবস ম্পদের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্যে যেসব প্রযুক্তি, জ্ঞান, ভাষ্য, রাজনীতি ও কার্যকলাপ ব্যবহার করা হয় সেগুলোই হল জৈব-রাজনীতি। শরীর থেকে ধনস ম্পদ ও পণ্যদ্রব্য বের করে আনার চেয়ে বরং সময় ও শ্রম বার করে আনা তার কাছে গুত্ব পায়। এই বায়ো-পাওয়ারের দুটি অভিমুখ থেকে সৃষ্টি হল ক্ষমতার দুটি মাত্রা ঃ (১) অনুশাসন এবং (২) প্রশাসনিকতা।

ফুকোর মতে এখন সার্বভৌম শক্তির আধার অনেকটাই সমগ্র সমাজ। এ হল অনুশাসন। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে ক্ষমতার তন্ত্রজাল শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায় সীমাবদ্ধ থ াকে না। তা পুরনো সার্বভৌমত্বের সাবেকি ছক মূলত মেনে চলে না। তার ছক আলাদা। তা হল অনুশাসনের ছক। সাবেকি আইনভিত্তিক চিন্তার পরিবর্তে এবার গুত্বের ভরকেন্দ্র সরে যেতে থাকল শরীর থেকে মনে, মননে, যুক্তিতে। আইনভঙ্গকারী দোষীকে ক্ষমতার নজরবন্দী করে রেখে তাকে সামাজিক অনুশাসনে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এ ভাবেই সৃষ্টি হল আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র। এই ক্ষমতাতন্ত্রে ক্ষমতার কোনো নির্দিষ্ট অধিকারী নেই, কোনো নির্দিষ্ট আধার নেই, কোনো কেন্দ্র নেই। নেগ্রি ও হার্ট-বর্ণিত নতুন 'সাম্রাজ্য' এরকমই এক ক্ষমতাতন্ত্র। আধুনিক অনুশাসনতন্ত্র বলেই 'সাম্রাজ্য'তে কোনো সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র আর বিষয়ী নয়। ত াই তার কোনো বিশ্ব নেতা রাষ্ট্র থাকা সম্ভব নয়।

ফুকোর মতে, ১৮ শতক থেকে এই নতুন ধরনের ক্ষমতাতন্ত্র পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজে মানুষের অস্তিত্বকে প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করছে। এর কর্মধারা সাবেকি আইন নয়, বরং স্বাভাবিকীকরণ। শাস্তি নয়, বরং স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এটি সুনিশ্চিত। এর কর্মপদ্ধতি সমস্ত স্তরে সমস্ত আকারে নিয়োজিত ও ব্যাপ্ত। রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠ ানের বাইরেও বিস্তৃত। ক্ষমতার এমন একটা চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে যাকে জাতি-রাষ্ট্র দিয়ে পুরোটা বোঝা যাবে না। ফুকো আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন—জেলখানা, স্কুল, হাসপাতাল, উন্মাদ-আশ্রম, কারখানা। এইসব আধুনিক প্রতিষ্ঠানে মানুষকে রাখা হয় নজরবন্দী অবস্থায়। ম ানুষকে রীতি অনুসারী করে তোলার জন্যে চলে নীরব অদৃশ্য প্রশিক্ষণ। শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে দেয় শক্তি ও শরীরের বশ্যতা। প্রাক্ আধুনিক ক্ষমতার জাঁকজমক প্রদর্শনের বিপরীতে আধুনিক ক্ষমতার থাকে ছোট ছোট গঠন। এই শাসন দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগের চেয়ে নির্ভর করে মানুষের চেতনা ও মনন নিয়ন্ত্রণের ওপর। অ াধুনিকতাই প্রথম সমাজ-দর্শন যা একেবারে সাধারণ মানুষের চেতনাতেও স্বাতন্ত্র্য আর কর্তৃত্বের মোহজাল রচনা করে। অনুশাসনের প্রক্রিয়া চলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে। অনুশাসনের উদ্দেশ্য সার্বভৌম শক্তির ভয় দেখানো নয়। তার উদ্দেশ্য স্ব-শাসন। আধুনিক সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়াই এমন যে তা কোনো স ার্বভৌম প্রভুর আদেশ না হয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তিজাত অনুশাসন হিসেবেই কাজ করতে চায়। এটাই তার নতুনত্ব। এ হল আধুনিক সমাজ যেখানে ক্ষমতার আদর্শ আর সার্বভৌমত্ব নয়। বরং এ হল কেন্দ্রবিহীন সর্বব্যাপী এক অনুশাসন তন্ত্র। এই সর্বব্যাপী ক্ষমতাতন্ত্র এবং তার দ্বারা লালিত স্বাভাবিকীকরণ ব্যক্তিকে, তার আচরণ, অভ্যাস ও চিন্তা-ভাবনাকে গঠন করে। এখানে সকল নাগরিক স্বাধীন। স্বাধীনভাবেই তারা অনুশাসনের শৃঙ্খল বা পরাধীনতার অদৃশ্য বন্ধন পরতে রাজি। আগেকার সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা অধিকারের সাবেকী বিরোধের তত্ত্বটি ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। সার্বভৌম এখানে স্বশাসনের অ াদর্শের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। ব্যক্তি গঠিত হচ্ছে ক্ষমতাতন্ত্রের দ্বারা। ফলে ব্যক্তির অধিকার-সংক্রান্ত যে উদারনৈতিক তত্ত্ব এক সময় গুত্ব পেয়েছিল তার আবেদন অ ার থাকছে না। অথবা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, বস্তুত আধুনিক পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক বা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বশাসিত গণত ান্ত্রিক সমাজের যা আদর্শ ফুকো সেটাকেই উলটো করে দেখাচ্ছেন। সাধারণ নাগরিকরা স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো ভোট দিয়ে শাসকদের নির্বাচিত করে। এটাই হল আধুনিক গণতন্ত্র। ফুকো এ ছবি উল্টো করে ধরলেন। ফুকো দেখালেন নাগরিকদের এমনভাবে অনুশাসনে শিক্ষিত করে তোলা হয় যে তারা ভ াবতে থাকে তারা স্বাধীন। ভাবতে থাকে নিজের পছন্দ মতো ভোট দিয়ে তারা ক্ষমতাকে বেছে নিয়েছে। নজরবন্দী করে রাখা অনুশাসনবদ্ধ নাগরিকদের এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। অর্থাৎ নাগরিকের 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র', 'অধিকার', 'ভোটদান'—এসবই অনুশাসন দ্বারা নির্মিত। আসলে সেই ক্ষমতাই সবচেয়ে প্রবলভাবে কার্যকর যা নিজেকে স্ব-শাসনের চেহারায় উপস্থাপনা করতে সক্ষম। অনুশাসনে এক সার্বিক নিয়মানুবর্তিতায় বেঁধে ফেলা হয় সবকিছু। বিপ্লবোত্তর ইউরোপে অর্থাৎ ১৮ শতকের শেষ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত সেই যুক্তি (Reason) ও মানব-কেন্দ্রিক মতবাদ (Humanism)-এর যুগে এল প্যানপটিকন (Panopticon)। ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের ভাবনা থেকে ফুকো প্যানপটিকনের উদাহরণ নিয়েছেন। এ হল ক্ষমতার এক নতুন তন্ত্র যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ সর্বদ্রষ্টা। বেন্থামের এই আদর্শ কারাগার কোনো শারীরিক উৎপীড়ন কেন্দ্র নয়। তা স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলা কেন্দ্র। স্বয়ং শাসিত। ক্ষমতার অদৃশ্য নজর এখানে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে কাজ করে। প্যানপটিকন কারাগারের মিনারের মাথায় যে রক্ষী নজরদারি করছে সে সবাইকে দেখছে কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। ফলে সে যদি মিনারের মাথায় নাও থাকে, অন্যেরা তার অনুপস্থিতি টের পাচ্ছে না। তাই তারা সর্বদা নিজেদের স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলায় বেঁধে রাখে। এভাবে অ াধুনিক ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক নীরবে, অনুস্তরে কাজ করে। ফুকো দেখাতে চান আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে অসংখ্য অদৃশ্য চোখ আমাদের ওপর প্রতিনিয়ত নজরদারি করছে। এই বোধ অস্বস্তিকর। এস পরিকল্পনার প্রতীকত্ব গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এভাবেই ফুকো আধুনিক সমাজ যে নিরন্তর প্রহরার মাধ্যমে, স্বাভা বিকীকরণের চাপে, মননকে শাসন করে চলেছে, তার ক্ষমতা-প্রক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করতে চান।

ফুকোর তত্ত্বে, ক্ষমতার তৃতীয় মাত্রাটি হল প্রশাসনিকতা। সাম্প্রতিক রাজনীতি চর্চায় এই প্রবণতাটি এসে পড়েছে। আধুনিক বিশ্বে ক্ষমতাতন্ত্রের মধ্যে এ এক গুত্বপূর্ণ প্রবণতা। উদারনীতিকরা যে রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়াটিকেই যথাসম্ভব রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, তার সূত্র ধরে প্রশাসনিকতার আলোচনায় আসা সম্ভব। অর্থাৎ রাজনীতি কমাও, প্রশাসনিক প্রকরণ আরও কার্যকর ও শক্তিশালী কর। নেগ্রি ও হার্টের 'সাম্রাজ্য' ধারণায় অন্তত বেশ কিছু অংশে ফুকোর প্রশ াসনিকতা বা জনসমষ্টি নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। এই প্রবণতাটিকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ফুকো। এক অর্থে প্রশাসনিকতা অন্তত উনিশ শতক থেকে আধুনিক রাষ্ট্রপ্রক্রিয়ার আংশ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এখানে প্রশাসনিক প্রকরণই মূল কথা। সার্বভৌমত্ব, অধিকার ইত্যাদি নৈতিক শ্লোগান অপেক্ষাকৃত গৌণ। এখানে গণতন্ত্র মানে জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়। প্রশাসন-যন্ত্রের কাছ থেকে প্রত্যাশামতো কাজ কিংবা সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে কিনা, জনগণ কেবল সেটাই যাচ াই করতে চাইবে। এর ফলে নাগরিকদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ নেবার প্রবণতা অনেক কমবে। ভোট দেবার ইচ্ছে, রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে কৌতূহলী হওয়া, এ সবই অনেক স্তিমিত হয়ে আসবে। বস্তুত সব দেশেই নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ভোটদানের হার কমেছে। অন্যদিকে বহুগুণে বাড়বে প্রশাসনিক প্রকরণ, জনগণের বিভিন্ন অংশের আচার-আচরণ, প্রয়োজন-প্রত্যাশা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রশাসনিক সমাধান বাতলে দেবার জন্যে বিশেষজ্ঞের দল। এর মূল কথা হল, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের জন্যে। কোনো সাধারণ অর্থে কল্যাণ নয়। বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনো কল্যাণের জন্যে। এক গোষ্ঠীর জন্যে কোনো একটা বিশেষ কল্যাণ হয়তো জরি প্রয়োজন যা অন্যদের দরক ার নেই। যেমন, জনগোষ্ঠীর কোনো বিশেষ অংশের রোজগার বাড়ানো প্রয়োজন। কোনো অংশের কর্মসংস্থান চাই। কোথাও কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচের বন্দোবস্ত হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কোনো গোষ্ঠীর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এসব সরকারি নীতি কার্যকর করতে গেলে ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ মানে র াষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ নয়। বরং জনগোষ্ঠী (population)-এর এক এক অংশের ব্যবহার, প্রবণতা, চাহিদা, স্বার্থ ইত্যাদি যাচাই করে তার মাধ্যমে জনকল্যাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বলপ্রয়োগ না করে আর্থিক উৎসাহ দেওয়া বা আর্থিক অন্তরায় সৃষ্টি করা।

সেটা জনগোষ্ঠীর কোনো অংশে নারী-শিক্ষা বা বয়স্ক-শিক্ষা পণপ্রথা রোধ, ডাইনি সন্দেহে পীড়ন, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাসস্থান সরিয়ে নেওয়া, এড্‌স বা সার্স বা আন্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এরকম অনেক কিছুই হতে পারে।

এই কায়দায় ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান অবলম্বন হল জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রশাসনিক জ্ঞান। বস্তুত স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান'। আধুনিক পশ্চিমি সমাজে যত বেশি করে প্রশাসনিকতা প্রসারিত হয়েছে ততই গড়ে উঠেছে জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের সম্বন্ধে সরকারি তথ্যসংগ্রহ। আধুনিক সেন্সাস হল এই প্রক্রিয়ার একটা বড় উদাহরণ। কিন্তু সেটা আধুনিক প্রশাসনিক জ্ঞানের অতি সামান্য এক অংশ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দৈনন্দিন কাজকর্ম, তা সামাজিক বা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বা সরকারি বা শারীরিক বা মানসিক যাই হোক না কেন সবই কোনো না কোনো ভাবে হাসপাতাল, স্কুল, পুরসভা, সরকারি খাদ্যদপ্তর, অর্থদপ্তর, স্বাস্থ্যদপ্তর, শিক্ষাদপ্তর, আদালত, পোস্ট অফিস, থানা, ব্যাঙ্ক, সমাজ গবেষণা সংস্থা, মার্কেট রিসার্চ সমীক্ষায় নথিবদ্ধ হয়ে এই বিশাল প্রশাসনিক জ্ঞানভাণ্ডারের অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। ঝিজুড়ে এইসব প্রকরণ ও তার আনুষঙ্গিক জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রসার ঘটছে। জনকল্যাণ, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, ত্রাণকার্য, পুনর্বাসন, জনস্বাস্থ্য, সাক্ষরতা, প্রশাসনিক শিক্ষার প্রসার—এসব কাজে ব্যবহৃত প্রশাসনিক প্রকরণ আজ আন্তর্জাতিক স্তরে সবদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আফগানিস্থানের অনেকটা প্রাক্‌-আধুনিক তালিবান রাষ্ট্র যদি প্রশাসনিকতার দিক থেকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে থাকে, তো তার অপসারণ ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ক্ষমতার তত্ত্বাবধান, অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ তাকে ঐ আধুনিক প্রশাসনিকতার প্রক্রিয়ার মধ্যে টেনে আনবে। ইরাকের সুদূর দুর্গম মভূমি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ও জ্ঞান যদি সংগ্রহ করায় এতদিন ঘাটতি থেকেও থাকে, এখন নতুন মার্কিনি ও ব্রিটিশ ক্ষমতাতন্ত্র তার পুনর্গঠনে নেমে ক্রমশ সে অভাব পুষিয়ে দেবে। এই বিপুল প্রশাসনিক জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হচ্ছে সমাজনীতি। জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যে। তা কার্যকর করছে শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, রাষ্ট্রের বাইরেরও বহু প্রতিষ্ঠান যারা এই ব্যাপক প্রশাসনিকতার অংশ। নানা আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে সে সব প্রশাসনিক প্রকরণ এখন কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হাজার হাজার বেসরকারি সংস্থার কাছেও পৌঁছে গেছে। সারা ঝিজুড়ে। এইসব প্রশাসনিক প্রকরণ সাংবিধানিক চরিত্র অথবা রাজনৈতিক মতবাদ (তা সে উদারনৈতিক ধনতান্ত্রিক হোক, অথবা সমাজতান্ত্রিক বা মিশ্র অর্থনীতির জনকল্যাণকামী হোক না কেন) নির্বিশেষে সব দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একই কাজে এবং একই উপায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশাসনিকতার এই ব্যাপক বিস্তার এক অর্থে পশ্চিমি উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদদের দ্বারা বর্ণিত রাজনৈতিক বিবাদের উত্তেজনা কমানোর পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত ও তার জন্যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সংগঠনগুলির মধ্যেকার বিরোধ যেন অবান্তর। কানাডা, আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। সরকার বদল, বার বার নির্বাচন সত্ত্বেও বিভিন্ন দলের প্রস্তাবিত কর্মসূচির তফাৎ কম। এক দলের সরকার গিয়ে অন্য দলের সরকার ক্ষমতায় এলেও আর্থিক-প্রশাসনিক নীতি বা কাজকর্মের পরিবর্তন কিছু হয় না। যেসব বিষয়ে বিবাদ তীব্র, তা হল জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অধিকার দাবি করা, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তাদের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব আদায় করা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ভাগ নিজের গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য টেনে নেওয়া। তার জন্যে সরকারের সাথে দর-কষাকষি। এইসব আপাত রাজনৈতিক বিরোধ আসলে প্রশাসনিকতার প্রক্রিয়ার ভেতর থেকেই জন্ম নিচ্ছে, তারই রূপরেখা অনুযায়ী পরিস্ফুট হচ্ছে এবং বিভিন্ন সময়ে সাময়িকভাবে নিষ্পন্ন হচ্ছে।

কেউই অস্বীকার করবেন না, আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের বিদ্ধে প্রতিরোধ হয় নিশ্চয়ই। তবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোনো গোষ্ঠী বা পুঁজিপতি শ্রেণীকে সরিয়ে দিলেও আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র একই ছকে চলবে। প্রতিরোধ হয় অনুশাসনের বেড়াজাল এড়ানোর চেষ্টায় কিংবা প্রশাসনিকতাকে অমান্য করায়। কিন্তু সেই সাময়িক অসুবিধা কাটিয়ে উঠে নতুন সমীক্ষা, নতুন তথ্য, নতুন নীতির সাহায্যে প্রশাসনিক প্রকরণ আরও কার্যকর, জনহিতকর, আরও কল্যাণকারী হয়ে ওঠে। এর ফলে আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র হয়ে যায় আরও পরিব্যাপ্ত, আরও কার্যকর।

ফুকো দেখিয়েছেন আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিতে সার্বভৌমত্ব, অনুশাসন এবং প্রশাসনিকতার ত্রিভুজের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করার চেষ্টা হবে। ফুকো বলছেন, আগেকার ক্ষমতা বিন্যাসকে সার্বভৌমত্বের ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেত। কিন্তু ১৮—১৯ শতকে ইউরোপে ক্ষমতার বিন্যাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে। সার্বভৌমত্বের সাবেকী ছক দিয়ে তাকে পুরোটা বোঝা যায় না। তাই দরকার হয় অনুশাসনের ধারণা ও প্রশাসনিকতার ধারণা। প্রশাসনিকতা আসা মানেই কিন্তু সার্বভৌমত্ব ও অনুশাসনের বিদায় নয়। বরং সার্বভৌমত্বের ভিত্তির সমস্যা ও অনুশাসনের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আরও গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফুকোর ভাষায়—''The notion of a government of population renders all the more acute the problem of the foundation of sovereignty (consider Rousseau) and all the more acute equally the necessity for the development of discipline....''। আমরা যারা লেনিনের সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র, কেন্দ্র-বিশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের ধারণা বনাম নেগ্রি ও হার্টের আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র-ধর্মী কেন্দ্রবিহীন নতুন 'সাম্রাজ্য' (empire)-এর ধারণার মধ্যে বিরোধে সংশয়ান্বিত; যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগভিত্তিক 'সাম্রাজ্যবাদ' বনাম মনন-নিয়ন্ত্রণকারী স্বেচ্ছামূলক অনুশাসন-ভিত্তিক 'সাম্রাজ্য' বিতর্কে হাবুডুবু খাচ্ছি; তাদের জন্যেই বোধহয় ফুকো এ তিন ধরনের মাত্রাবিশিষ্ট ক্ষমতার ত্রিভুজ ধারণার উল্লেখ করেছেন—''Accordingly, we need to see things not in terms of the replacement of a society of sovereignty by a disciplinary society and the subsequent replacement of a disciplinary society by a society of government; in reality one has a triangle, sovereignty–discipline–government, which has as its primary target the population and as its essential mechanism the apparatuses of security.''

সার্বভৌম ক্ষমতার বিপরীতে অনুশাসন। তবু সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব টিকে থেকে গেল কেন ফুকো তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ১৮ শতকে ও ১৯ শতকে অনুশাসিত সমাজের বিকাশকে বাধা দেয় যেসব শক্তি তাদের এবং রাজতন্ত্রের সমালোচনার স্থায়ী হাতিয়ার ছিল সার্বভৌমের তত্ত্ব। একই সাথে এটি ও সংশ্লিষ্ট আইনি সংগঠন অনুশাসন ব্যবস্থার ওপর একটা অধিকার ব্যবস্থাকে স্থাপিত করে। এমনভাবে যাতে তার আসল পদ্ধতিগুলো গোপন থাকে। এ প্রকৌশলগুলোর মধ্যে প্রভুত্বের যে উপাদান থাকে তাও যাতে গোপন থাকে। সার্বভৌমত্বের গণতন্ত্রীকরণ মূলগতভাবে নির্ধারিত হয় অনুশাসনের বলপ্রয়োগ (coercion) দ্বারা ও প্রোথিত থাকে অনুশাসনের বলপ্রয়োগের মধ্যে। যখন অনুশাসনকে প্রভুত্ব (domination)-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করার দরকার হয়, ও একই সাথে তাকে গোপন রাখতে হয়, তখন সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব দরকার হয় আইনি যন্ত্রের স্তরে একটা বাহ্যিক রূপ বজায় রাখতে। ক্ষমতার ক্ষেত্রকে সংজ্ঞায়িত করে দুটি সীমা (১) সার্বভৌমত্বের প্রকাশ্য অধিকার ও (২) বহুরূপ বিশিষ্ট অনুশাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এ দুই সীমা খুব অসমসত্ত্ব। আধুনিক সমাজে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় এ দুটির এই অসমসত্ত্বতারই মাধ্যমে, তার ভিত্তিতে, ও তার দ্বারা। এটা ঠিকই যে সার্বভৌমত্বের সাথে অনুশাসনের অভিন্ন সাধারণ জায়গা কিছু নেই। তবু মানব-বিজ্ঞানগুলোর ডিসকোর্স যে প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়েছে তা হল এ দুই ব্যবস্থার গা ঘেঁষে থাকা (juxtaposition) ও মুখোমুখি হওয়া। আজকের যুগে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়

এই দুইয়ের মাধ্যমে, একই সাথে। একদিকে, অধিকারের পুনঃসংগঠন যা সার্বভৌমত্বকে ক্ষমতামণ্ডিত করে। অন্যদিকে, বলপ্রয়োগের সেই সব ব্যবস্থা যা অনুশাসনের রূপ নেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিকাশ; আচরণ, আকাঙ্খা ও ডিসকোর্সের সাধারণভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে যুক্ত হওয়া—এসব ঘটে সার্বভৌমত্ব ও অনুশাসনের দুই অসমসত্ব স্তরের মধ্যেকার ছেদবিন্দুতে। ফুকো বলছেন, অনুশাসনতন্ত্রের বিদ্ধে সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্য চেয়ে তার কাছে গিয়ে লাভ নেই, তাতে করে অনুশাসনধর্মী ক্ষমতার ফলাফল (effects) কে সীমিত করা যাবে না। কারণ সার্বভৌম ও অনুশাসন আমাদের সমাজে ক্ষমতার সাধারণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ফুকোর নিজের ভাষায়—''because sovereignty and disciplinary mechanisms are two absolutely integral constituents of the general mechanism of power in our society''।

আমাদের বুঝতে হবে, 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'সাম্রাজ্য' এ দুই ধরনের ক্ষমতা আজকের বিশ্ব ক্ষমতার সাধারণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। যদিও তারা একে অন্যের বিপরীত তাও। আজকের লেনিন-পন্থীরা বলছেন, এমপায়ার, ফুকোর বায়ো-পাওয়ার, অনুশাসন ও প্রশাসনিকতার ধারণাগুলো প্রতিক্রিয়াশীল। পুঁজিবাদের বৌদ্ধিক অস্ত্র। আর এম্পায়ার-পন্থীরা বলছেন সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব সেকেলে, বস্তাপচা। আমার মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদও যেমন আজ সত্য, তেমনি একই সাথে তার পাশাপাশি 'সাম্রাজ্য' গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াও চলমান। সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ (যেমন-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ) ও তার হিংস্র যুদ্ধ-আগ্রাসন যেমন সত্য, তেমনি সত্য শান্তিপূর্ণ, সভ্য, পশ্চিমি গণতন্ত্র-সম্মত, স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত, কেন্দ্রহীন, মনন-নিয়ন্ত্রণকারী, তথ্য-প্রযুক্তি-নির্ভর 'সাম্রাজ্য' গড়ার জন্যে আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের প্রয়াস। 'সাম্রাজ্যবাদ' অথবা 'সাম্রাজ্য' এ দুই চরম বিপরীত মে-অবস্থান, আধুনিকতাবাদী ভাবনার এই প্রচলিত বাইনারিকে ভেঙে, তার Either-or ছক থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার। জটিল বিশ্ব বাস্তবতাটা এদের বাইরে কোথাও অর্থাৎ এদের উভয়েরই মধ্যে কোথাও অর্থাৎ এমন কোথাও যার মধ্যে এরা উভয়েই উপস্থিত, এদের পারস্পরিক বহির্ভূতি (mutual exclusiveness)-এর গণ্ডিকে অতিক্রম করে। 'সাম্রাজ্য' আর 'সাম্রাজ্যবাদ' পরস্পর অতি-নির্ণীত। তার ফলে কোন দিকটি কখন বড় হয়ে দেখা দেবে তা আগে থাকতে জানা বা বলা যাবে না। তা অনিশ্চিত, অ-নির্ধারিত, contingent। তাছাড়া সেটাতো "পূর্বপ্রদত্ত" (given) কিছু নয়। নিপীড়িত জাতি, শ্রমজীবী শ্রেণী, নিম্নবর্গ, বিশ্বের জনতা (multitude), নারী, সংখ্যালঘু, দরিদ্র, দলিত ও নিম্নবর্ণ, প্রান্তবাসী, পরিবেশবাদী, অ-শ্রেতকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রাম, ক্ষমতার লড়াই, দ্বন্দ্ব বিরোধ সেই বিষয়টিকে অনেকটা স্থির করবে। সাম্রাজ্যবাদ-সাম্রাজ্য বনাম পদদলিত-শোষিত মানুষ—এ দুই পক্ষের পারস্পরিক ক্ষমতা-বিন্যাস, ক্ষমতার ভারসাম্য ও ক্ষমতার অনুপাত সে বিষয়কে অনেকটা নির্ধারণ করবে। আর সর্বোপরি, আমরা তৃতীয় বিশ্বের পোস্ট কলোনির মানুষ। আমাদের শরীরে সাম্রাজ্যবাদের বুটের দাগ, রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। আমাদের মননে রিসার্চ পেপার, মসৃণ সিডি-ফ্লপিতে তোলা আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব। আমরা সাম্রাজ্যবাদের সার্বভৌম ক্ষমতাকে চিনি, আবার সাম্রাজ্যের অনুশাসন-প্রশাসনিকতাকেও জানি। আমরা দরিদ্র। কিন্তু আমাদের মননের ভাণ্ডারে অভিজ্ঞতার ঐর্শ্য। ওদের চেয়ে আমাদের ক্ষমতার অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র ও গভীরতা বেশি। সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োগ করে হিংসা, শক্তি। সাম্রাজ্য শক্তি প্রয়োগ করে না, করে নিয়ন্ত্রণ। শক্তির সীমা আছে, নিয়ন্ত্রণের কোনো সীমা নেই। অদৃশ্য ক্ষমতার সূক্ষ্ম তন্ত্রজাল। সাম্রাজ্যবাদের লেনিনীয় তত্ত্ব মানলে আফগানিস্থান, ইরাক আক্রমণ স্বাভাবিক, অনিবার্য। সাম্রাজ্যের নেগ্রি হার্ট তত্ত্ব মানলে ইরাক আক্রমণ ব্যতিক্রম। ফুকো ক্ষমতার ত্রিভুজ দিয়ে আজকের ক্ষমতা ব্যবস্থাকে বুঝতে চেয়েছেন। তবে নিজে তিনি সার্বভৌমত্বের চেয়ে জৈব ক্ষমতা, অনুশাসন, স্বাভাবিকীকরণ, নজরদারি, প্রশাসনিকতা বা জন-সমষ্টি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা করেছেন বেশি। ক্ষমতার সাথে অর্থনীতির যোগও তাঁর রচনায় উপেক্ষিত। সেসব ঘাটতি পুষিয়ে দিতে আমাদের ভাবতে হবে অর্থনৈতিক স্তর এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে মার্কসবাদের গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণগুলোর সাহায্যে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বকামী হিংস্র নগ্ন উপস্থিতি। তার মানে এই নয় যে আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ও 'সাম্রাজ্য' গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেমে যাবে। এই নয় যে পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বে ও সংস্কৃতিতে এন্‌লাইটেন্‌মেন্টের ক্ষমতা-এষণা মিলিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এ তিন অতি-নির্নীত। সার্বভৌমত্ব-অনুশাসন-প্রশাসনিকতা ক্ষমতার এ তিন মাত্রাও অতি-নির্ণীত। আর তাই সাম্রাজ্যবাদ-সাম্রাজ্যও অতি-নির্ণীত।

ঋণ-স্বীকার

* আলতুসেরের অতি-নির্ণয় (overdetermination) ধারণা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে আমি স্টাডি সার্কলের আলোচক শ্রীদীপংকর দাসের কাছে ঋণী।
* 'সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য অতিনির্ণীত' এরকম একটি বাক্য অন্যস্বর-এর ইরাক সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধে লিখেও শ্রীঅনুপ ধর বাক্যটির সম্ভাবনাকে ভ্রূণাবস্থায় হত্যা করেছেন। তাঁর মননশীল প্রবন্ধটি সেদিকে এগোয়নি। এতে ক্ষতি হয়েছে আমাদের, পাঠকদের।
* ফুকোর ক্ষমতার ত্রিভুজ নিয়ে আমার ভী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহ জুগিয়েছিলেন ঋিজিৎ রায়, মধুসূদন নন্দন, পার্থ বসু।
* ইরাক নিয়ে দৈনন্দিন মার্কসবাদী আবেগের অংশীদার ছিলেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ্য সেন, অমিতাভ চন্দ্র, সুপ্রতিম দাশ।

সূত্র

১. War on the people of the world, অন্যস্বর *other Voice,* Kolkata, April 2003,
২. Stephen K.White, *Political theory and postmodernism,* cambridge, 1991,
৩. চেতনা, যুদ্ধ বিরোধী সংখ্যা, ৮ (মার্চ, ২০০৩),
৪. অমিয় কুমার বাগচী, ঋায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, ১ম এবং ২য় খণ্ড, এন. বি. এ., কলকাতা, ২০০২,
৫. রবার্ট ফিস্ক, 'লুণ্ঠন অভিযানের শেষ পাদে বাগদাদ', অন্যস্বর *other Voice,* ইরাকে শু শেষ কোথায়, বিশেষ সংখ্যা (মে ২০০৩),
৬. ঋিজিৎ রায়, 'ঋিজুড়ে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন অন্ধকারে আলো', অন্যস্বর *other Voice,* পূর্বোক্ত।
৭. অমিতাভ চন্দ্র, 'মানবতার শত্রু মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইরাক গ্রাস ঋিব্যাপী যুদ্ধবিরোধী উত্তাল গণবিক্ষোভই গড়ে তুলবে আগামী দিনের প্রতিরোধের ব্যারিকেড', অন্যস্বর *Other Voice,* পূর্বোক্ত।
৮. মধুসূদন নন্দন, 'ইরাক যুদ্ধ আমাদের বাস্তবতা', অন্যস্বর, *Other Voice*, পূর্বোক্ত।
৯. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়, 'শুধু ওরা নয় আক্রান্ত আমরাও', অন্যস্বর *Other Voice*, পূর্বোক্ত।
১০. প্রদীপ বসু, 'ইরাক যুদ্ধ কথা বলছেন মার্কসবাদী ও উত্তর আধুনিক', অন্যস্বর *Other Voice*, পূর্বোক্ত।

১১. প্রকাশ কারাত, ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রসঙ্গ বিশ্বায়ন, জাতিরাষ্ট্র ও শ্রেণী সংগ্রাম’, অমিয় কুমার বাগচি (সম্পা.), বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, ১ম খণ্ড, এন. বি. এ., কলকাতা ২০০২,

১২. M. Foucault, *Discipline and punish : The Birth of the prison.* Pantheon, 1977,

১৩. অঞ্জন ঘোষ, ‘ক্ষমতার কথা’, ‘সমাজ ও চিন্তা’ আয়োজিত ৪৬-তম সেমিনার, ৬ আগস্ট, ১৯৯৫, (বক্তৃতা)।

১৪. সমীর কুমার দাস, ‘ফুকো, ক্ষমতা ও ভারতবর্ষ’, ‘সমাজ ও চিন্তা’ আয়োজিত ৬০-তম সেমিনার, ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭, (বক্তৃতা)।

১৫. দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ক্ষমতা গ্রামশি থেকে ফুকো’, ‘সমাজ ও চিন্তা’ এবং ‘ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল’ আয়োজিত ৭০-তম সেমিনার, ২৫ আগস্ট ২০০১, (বক্তৃতা)।

১৬. দীপক দাশ, ‘(ফুকোর) ক্ষমতার কথা’, ‘সমাজ ও চিন্তা’ এবং ‘ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল’ আয়োজিত ৮০-তম সেমিনার, ২৩ জুন, ২০০২, (বক্তৃতা)।

১৭. কল্যাণ সেনগুপ্ত, ‘ফুকোর ক্ষমতা’, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সেমিনার, ২২ মার্চ, ২০০২, (বক্তৃতা)।

১৮. Mark poster, *Foucault, Marxism and history,* polity, Cambridge, 1985.

১৯. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মহাশান্তির পরে বিশ্ব, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০১।

২০. Behind the Invasion of Iraq, *Aspects of India’s Economy,* Nos. 33 and 34, Mumbai, December 2002, Research Unit for political Ecomomy.

২১. মানব মুখার্জী, ইরাক ২০০৩, এন. বি. এ., কলকাতা, ২০০৩।

২২. Lenin, *Imperialism, the highest Stage of Capitalism,* Foreign languages press, peking, 1975.

২৩. John Bellamy Foster’s article on Empire in Internet.

২৪. Gopal Balakrishnan’s article on Empire in Internet.

২৫. Michael Hardt and Antonio Negri, *Empire,* Harvard University Press, 2001.

২৬. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ‘শাসিতের গণতন্ত্র’, ‘সমাজ ও চিন্তা’ এবং ‘ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল’ আয়োজিত ৭৬-তম সেমিনার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, (বক্তৃতা)।

২৭. অনীক, ৩৯,৯ (মার্চ, ২০০৩); ৩৯,৮ (ফেব্রুয়ারি, ২০০৩); ৩৯, ৬ (ডিসেম্বর ২০০২); ৩৯, ১০-১১ (এপ্রিল মে, ২০০৩)।

২৮. ইরাকে শু শেষ কোথায়, অন্যস্বর *Other Voice,* ইরাক যুদ্ধ ২০০৩ বিশেষ সংখ্যা, মে ২০০৩, কলকাতা।

২৯. অনুপ ধর, ‘কেন এই যুদ্ধ—কিছু প্রশ্ন’, অন্যস্বর *Other Voice,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-৩৪।

৩০. Anjan Chakrabarti, ‘Aftermath of Iraq: what should be a Radical Marxist Project?’ অন্যস্বর *Other Voice*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-১১৯।

৩১. Samir Amin, ‘Confronting Empire’, *Correspondence*, I.I.M.S. (Delhi Chapter), 1 (March, 2003).

৩২. B. Sivaraman, ‘Imperialism or Empire?’, *Liberation,* New Series 9, 10 (Feb, 2003).

৩৩. কল্যাণ সান্যাল, ‘বিশ্বায়ন ও উত্তর ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ’, ‘সমাজ ও চিন্তা’ এবং ‘ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল’ আয়োজিত ৮৮-তম সেমিনার, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩, (বক্তৃতা)।

৩৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসের উত্তরাধিকার, আনন্দ, কলকাতা, ২০০০।

৩৫. M. Foucault, *Politics, Philosophy, Culture*, Rouledge, N.Y. & London, 1988.

৩৬. M. Foucault, *Power,* Allen Lane, Penguin Press, 2000.

৩৭. দীপক কুমার দাশ, ‘ক্ষমতা ও আধিপত্য, তত্ত্বচর্চার রূপরেখা’, সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.), রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি, একুশে, কলকাতা ২০০২।

৩৮. দীপেশ চক্রবর্তী, ‘কলকাতায় ফুকো’, কথাপট, মিশেল ফুকো সংখ্যা, ১ (জানুয়ারি, ১৯৯৮)।

৩৯. T.J. Armstrong, *Michel Foucault : Philosopher,* Harvester Wheatsheaf, New York, 1992.

৪০. Gane & Johnson, *Foucault’s New Domains,* Routledge, London & N.Y. 1993.

৪১. M. Foucault, *Power/Knowledge*, Pantheon, New York, 1980.

৪২. Jon Simons, *Foucault & the Political,* Routledge, London & তৃ.দ্ধ., ১৯৯৫.

৪৩. Paul Rabinow (ed.), *The Foucault Reader,* Pantheon, N.Y., 1984.

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com